হারেমের কাহিনী

জীবন ও যৌনতা

সাযযাদ কাদির

সেই প্রাচীনকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত **'হারেম'** ছিল বহু রমণীকে ভোগ করার এক বিচিত্র ব্যবস্থা। এ প্রথা রাজপুরুষেরা চালু করেছিলেন নানা দেশে, ভারতেও ছিল এ যৌনবিলাসের অফুরন্ত আয়োজন। রাজা-মহারাজা বাদশাহ-নবাবদের অনেকেই নিজেদের কামনা-বাসনা, অদম্য ভোগস্পৃহা, বিকৃত ক্ষুধা ও লালসা মেটাতে প্রাসাদের অন্য প্রান্তে গড়ে তুলতেন ব্যক্তিগত হারেম, যেখানে পাওয়া যেতো তাঁদের অন্য এক রূপ, অন্য এক পরিচয়। হারেমের ইতিহাস-নির্ভর এই তথ্যাশ্রয়ী গ্রন্থে রয়েছে তাঁদের জীবন ও যৌনতার নানা বিস্ময়কর কাহিনী। কাশ্মীরের রাজা বক্রাদিত্যের ছিল অসংখ্য রূপসীতে ঠাসা এক বিশাল হারেম। দিনে রাতে সময় পেলেই তিনি পর্যায়ক্রমে মিলিত হতেন ওই রূপসীদের সঙ্গে। এমন অক্লান্ত কামুকতা ও অমিতাচারের কারণেই রাজত্বের সাত বছরের মাথায় তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে জানা যায়। সম্রাট আকবরের হারেমে ছিল পাঁচ হাজারের বেশি রূপসী। রাজধানীর বাইরে কোথাও গেলেও তাঁর সঙ্গী হতে হতো তাদের। নোংরা মহল্লার এক নাচনেওয়ালিকে শাহি হারেমে তুলেছিলেন সম্রাট শাহজাহান। ও নিয়ে আপত্তি উঠলে বলেছিলেন, সব মিষ্টান্নই সুস্বাদু—তা যে দোকানেরই হোক!

হারেমের কাহিনী

জীবন ও যৌনতা

সাযযাদ কাদির

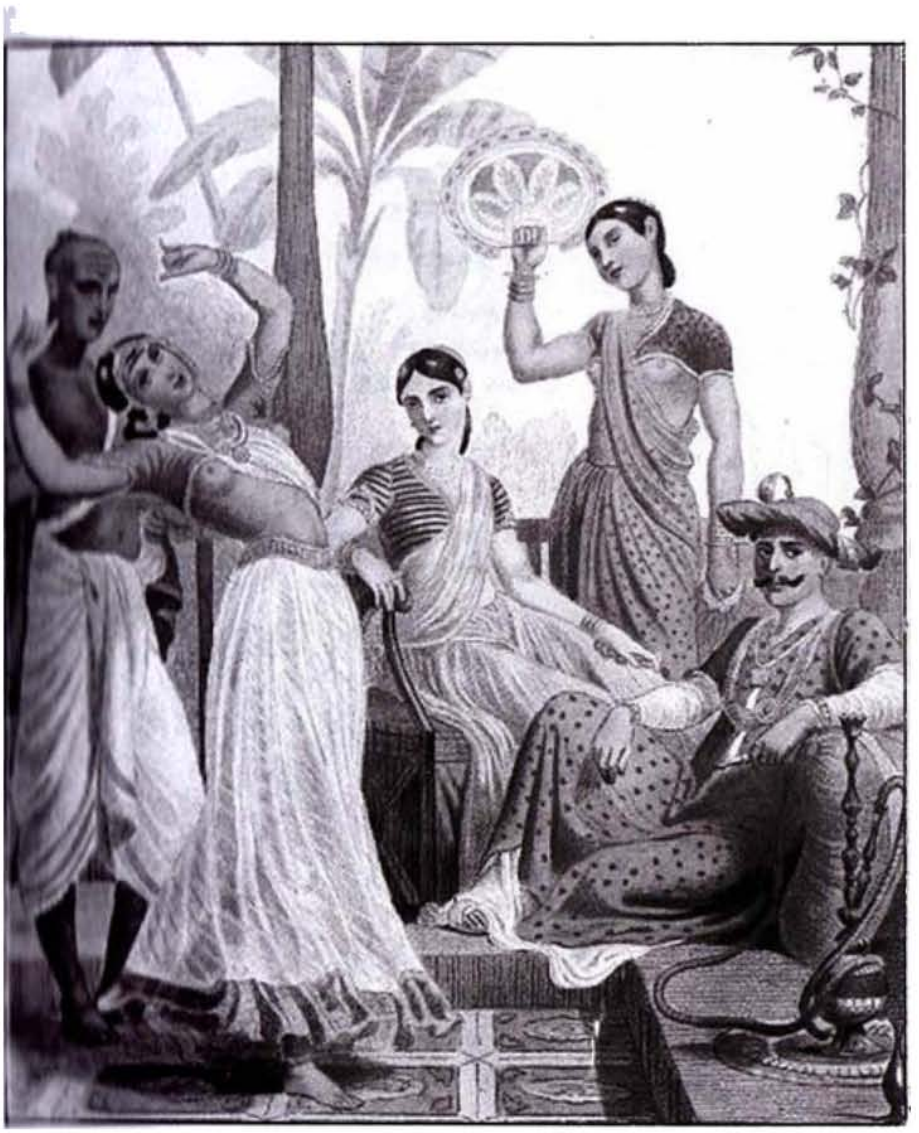

'হারেম' শব্দের উৎপত্তি

বলা হয় 'হারেম' শব্দটি এসেছে আরবি 'হারাম' (অবৈধ) কথাটি থেকে। তুর্কিরা কথাটিকে সহনীয় করে নেয়, তারপর যোগ করে 'লিক'। ফলে তুর্কি ভাষায় বাড়ির যে অংশে মহিলারা থাকেন তার নাম হয় 'হারেমলিক'। ইউরোপীয়রা 'হারেম'কে জানে 'সেরালিয়ো' নামে। এখানে ইতালিয়ান ও ফারসি ভাষার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। ইতালিয়ান ভাষায় 'সেররালিয়োন' কথাটির অর্থ 'বন্য প্রাণীর খাঁচা'। এর উৎপত্তি লাতিন 'সেরা' (গরাদ) থেকে। তবে ফারসি 'সরা' ও 'সরাই' (ভবন, বিশেষ করে প্রাসাদ, কিন্তু উপমহাদেশে অর্থ দাঁড়িয়েছে বিরতিস্থল ও পান্থশালা) শব্দের সঙ্গে কাকতালীয় সাদৃশ্যের কারণে এমন অর্থান্তর ঘটেছে এর।

রাজপরিবারের মহিলাদের আবাসস্থল হিন্দু সমাজে 'অন্তঃপুর' নামে পরিচিত। এ কথাটি থেকে বোঝা যেতো প্রাসাদে তাদের অবস্থান কোথায় : নিরাপদ, আশ্রিত ও সাধারণ লোকচক্ষুর আড়ালে। তবে হিন্দু ও মুসলিম হারেমে সাদৃশ্য ছিল অনেক। 'অন্তঃপুর' কথাটির আদি অর্থ ছিল নগরীর কেন্দ্রস্থলে নির্মিত নিরাপত্তা ও সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা। পালি ভাষায় মহিলাদের আবাসস্থলকে বলা হয় 'ইত্থাগারা' (স্ত্রী-আগার)।

পুরুষদের বহুগামিতা

এক পুরুষ কর্তৃক বহু নারীভোগের বিষয়টি উল্লিখিত হয় নি বেদে। এ-প্রথা বেদ-উত্তর কালের। ব্রাহ্মণ্য উপনিষদে (আনুমানিক ৫০০ পূর্বাব্দ) অবশ্য বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। 'জাতক'কে যদি প্রাক-বৌদ্ধযুগের সমাজচিত্র বলে গ্রহণ করা যায় তা হলে বলতে হয় বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে, পূর্বাব্দের পঞ্চম শতকে, পুরুষদের বহুগামিতা প্রচলিত ছিল বিশেষভাবে। 'মহাপদ্মজাতক'-এ ১৬ হাজার রমণী-অধ্যুষিত এক রাজকীয় 'সেরালিয়ো'র উল্লেখ আছে। সংখ্যাটি হয়তো অতিরঞ্জিত, কিন্তু এই উল্লেখ প্রাকবৌদ্ধ যুগে 'ইত্থাগারা' থাকার এক অকাট্য প্রমাণ। অবন্তী'র রাজা প্রদ্যোৎ, মগধের রাজা বিম্বিসার (আনুমানিক ৫৪৬-৯৪ পূর্বাব্দ), বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু (আনুমানিক ৪৬২-৯৪ পূর্বাব্দ) এবং স্বয়ং বুদ্ধদেব (আনুমানিক ৫৬৬-৪৮৬ পূর্বাব্দ)-এর সমসাময়িক রাজা উদয়নের শাসনকালে হারেম ছিল বলে উল্লেখ আছে ওই বৃত্তান্তে।

বনভোজনে যাওয়ার সময় উদয়ন (পালি বৃত্তান্তে 'উদেনা') তাঁর হারেম নিয়ে যেতেন সঙ্গে। একবার তিনি যখন তাঁর শিবিরে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন হারেমের রমণীরা গিয়েছিল প্রখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পিণ্ডোলা ভরদ্বাজ-এর মুখে ধর্মকথা শুনতে। ঘুম থেকে জেগে এ খবর পেয়ে উদয়ন এত ক্রুদ্ধ হন যে পিণ্ডোলাকে ধরে এনে তাঁর দেহে বেঁধে দেন বাদামি পিঁপড়ার বাসা। পরে উদয়ন অবশ্য ওই সন্ন্যাসীর কাছেই দীক্ষিত হন বৌদ্ধধর্মে। আরেকবার বনভোজনের সময় অনেক সহচরী সহ রানী সমাবতী মৃত্যুবরণ করেন নারী-আবাসে সংঘটিত এক অস্বাভাবিক অগ্নিকাণ্ডে।

হারেমের গঠনপ্রণালী

প্রাকৃতিক দিক দিয়ে উপযোগী স্থানে হারেম বা অন্তঃপুর নির্মাণের পরামর্শ দেয়া হতো রাজাদের। এতে থাকতো অনেকগুলো কক্ষ; এক কক্ষের মধ্যে থাকতো আরও এক কক্ষ; চারদিক পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত, দরজা থাকতো মাত্র একটি। অন্তঃপুরে যাতে আগুন না লাগে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হতো। বজ্রপাতে দগ্ধ বস্তুর ছাইয়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টিতে কর্দমাক্ত মাটি মিশিয়ে তৈরি করা হতো এর দেয়াল। ডান থেকে বাঁয়ে তিন বার প্রদক্ষিণ করে বিশেষ মন্ত্র পাঠ করা হতো তখন। হারেমের ভেতরে-বাইরে লাগানো হতো জীবন্তী, শ্বেতা, মুষ্কক ও বন্দক লতার গাছ। ওই লতা তুলে দেয়া হতো পেজাত ও অশ্বত্থ গাছের ডালে। এসব লতা ও গাছের জন্য নাকি বিষধর সাপ ভেতরে ঢুকতে পারতো না। আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পোষা হতো বিড়াল, ময়ূর, বেজি ও চিত্রল হরিণ। এসব প্রাণী সাপ দেখলে আক্রমণ করতো, তারপর খেয়েও ফেলতো।

হারেমের ভেতরে সাপের বিষ নির্ণয় করার জন্য পোষা হতো টিয়া, সারিকা ও ভৃঙ্গরাজ পাখি। সাপের বিষের গন্ধ পেলেই এসব পাখি ছটফট শুরু করতো। খাদ্যে বিষ নির্ণয়ের জন্য আরও পোষা হতো ক্রৌঞ্চ, জীবঙ্গ-জীবক, মত্ত কোকিল ও চকোর পাখি। আশপাশে বিষ থাকলে নানারকম প্রতিক্রিয়া হতো এসব পাখির মধ্যে। ক্রৌঞ্চ মূর্ছা যেতো, জীবঙ্গ-জীবক অবসন্ন হয়ে পড়তো, মত্ত কোকিল মারা যেতো, আর রক্তবর্ণ ধারণ করতো চকোরের চোখ। বস্তুত সেকালের শাসকরা বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে আতঙ্কিত থাকতেন সবসময়।

হারেম-রমণীদের জন্য থাকতেন নির্ধারিত চিকিৎসক। হারেমের এক প্রান্তে, বিশেষ করে পেছন দিকে, থাকতো ধাত্রীবিদ্যা ও বিভিন্ন ব্যধিতে ব্যবহৃত ওষুধ-পথ্যের ভাঁড়ার। মুসলিম ও হিন্দু শাসনামলে হারেম-রমণীদের জন্য আলাদা চিকিৎসালয় স্থাপন গণ্য হতো অত্যাবশ্যক বলে।

হারেমে সর্বাধিক গুরুত্ব পেতো আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা। অন্তঃপুরের একাংশে থাকতো বাদ্যযন্ত্র এবং হাতি, ঘোড়া ও রথের সাজসজ্জা। এগুলোর বিশেষ প্রয়োজন পড়তো পুরনারীদের বিহারকালে।

পরবর্তী কালের হারেম

কোনও-কোনও কামবিলাসী রাজা মাঝে মধ্যে মেলা বসাতেন প্রাসাদে। সেসব সমাবেশে অন্তঃপুরের মহিলাদেরই থাকতো প্রাধান্য। সেই মেলা হারেমের অভ্যন্তরে সুপরিসর অংশে না প্রাসাদের বিশাল কক্ষগুলোতে বসতো তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। 'জ্ঞান রত্নচূড়' আখ্যায়িত কাশ্মীরের রাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১) ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। আমোদ-প্রমোদের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল প্রবল। দিনের বেশির ভাগ সময় তিনি ঘুমিয়ে কাটাতেন, আর সারা রাত জেগে জমাতেন আসর। সেই আসর বসতো হাজার প্রদীপে আলোকিত সভাকক্ষে। সেখানে জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে আলাপ-

আলোচনা আর নাচ-গান চলতো। একসময় আলাপ-আলোচনা শেষ হওয়ার পর সে-আসরে শোনা যেতো শুধু পান চিবুনোর শব্দ আর অলঙ্কারে শোভিত ও শেফালি ফুলে সজ্জিত রমণীদের কলহাস্য ও অঙ্গসঞ্চালনের মৃদুধ্বনি। এভাবে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো ওই কক্ষে। চাঁদোয়াকে মেঘমালা, প্রদীপগুলোকে অগ্নিকুণ্ড, স্বর্ণদণ্ডকে বিদ্যুৎশিখা ও তরবারিগুলোকে ধূম্রপুঞ্জ কল্পনা করা হতো তখন। সুন্দরী রমণীরা স্বর্গের অপ্সরী ও মন্ত্রীরা নক্ষত্রমণ্ডলীর ভূমিকা গ্রহণ করতেন। পণ্ডিতরা তপোবনের ঋষি ও গায়ক-গায়িকারা স্বর্গলোকের গন্ধর্ব বিবেচিত হতেন। এই মেলাকে বলা হতো ধন-দেবতা কুবের ও মৃত্যু-দেবতা যমের সম্মিলন-স্থল—স্বেচ্ছাচার ও আতঙ্কের এক যৌথ বিনোদন-ব্যবস্থা।

কাশ্মিরের রাজা উচ্চল (১১০১-১১১১) যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর অনুগত দমর গোত্রাধিপতি ভীমদেব দু'টি উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁকে। এর একটি ছিল অন্তঃপুর সম্পর্কে। রাজাকে বলা হয়েছিল, সকালবেলা প্রাসাদ-অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে তিনি যেন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাইরের সভাকক্ষে থাকেন। তা হলে তিনি প্রজাসাধারণের বক্তব্য শুনতে পাবেন, সেইসঙ্গে নিজের ও মন্ত্রীদের সম্পর্কে মতামত জানতে পারবেন।

কাশ্মিরি শাসক চক্রবর্মণ (৯৩৬-৩৭)-এর রাজত্বকালে অন্তঃপুরের জানালাগুলো বানানো হয়েছিল গোলাকার করে। কলহণ-এর বিবরণে জানা যায়, সংগীতানুষ্ঠান চলাকালে ওই জানালাগুলোতে দেখা যেতো সেরালিয়ো'র অনেক হরিণনয়না সুন্দরীর মুখ। গান শুনতে আগ্রহী হয়ে তাঁরা আলোকিত জানালায় এসে দাঁড়াতেন। তাঁদের অঙ্গসৌরভ ভেসে আসতো সেদিক থেকে। অন্তঃপুরের শয্যাকক্ষ কখনও-কখনও হয়ে উঠতো আশ্রয়স্থল—বিশেষ করে রাজ্যে যখন সঙ্কট দেখা দিতো। দমর গোত্রের কতিপয় তস্কর চক্রান্ত করে রাজা চক্রবর্মণকে হত্যার। রাতের বেলায় রাজা নিরস্ত্র ও অসতর্ক থাকবেন এটা তাদের জানা ছিল। ঘটনার রাতে চক্রবর্মণ অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে ঢুকে পড়েন শয্যাকক্ষে। সেখানে গিয়ে তিনি আর অস্ত্রের সন্ধান নেন নি, স্বপক-গোত্রীয় পাটরানী হংসী'র বিশাল বক্ষদেশে মুখ রেখে শুয়ে পড়েছিলেন। দমর দুর্বৃত্তরা ওই অবস্থাতেই হত্যা করে তাঁকে।

পাটরানীদের বিশেষ ক্ষমতা ছিল অন্তঃপুরে। রাজার অনেক উপপত্নীই থাকতো তাঁদের অধীনে। রাজা কলষ-এর রানী ছিল ৭২ জন, তাঁর পূর্বসূরি উন্মত্তবন্তী (৯৩৭-৩৯)-র ছিল ১৪ জন।

১৩৪৬-১৬৪৬ অব্দে বিজয়নগরে অন্তঃপুরের জন্য নির্মাণ করা হতো বৃহৎ অট্টালিকা। পর্তুগিজ পর্যটক পায়েস (১৫২০-২২) লিখেছেন : "রাজার প্রত্যেক বৈধ পত্নী থাকতেন নিজস্ব ভবনে। তাঁদের সেবাযত্নের জন্য ছিল সহচরী, পরিচারিকা, প্রহরিণী ও দাসী।" ভবনের ভেতরে খোজা প্রহরী ছাড়া কোনও পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। বিজয়নগর ভ্রমণকারী আরেক পর্যটক নুনিজ (১৫৩৫-৩৭) দিয়েছেন কিছুটা ভিন্ন বিবরণ। তিনি জানিয়েছেন, ওই রমণীরা মূল প্রাসাদের অভ্যন্তরেই থাকতেন বিভিন্ন কক্ষে। রাজপ্রাসাদের কক্ষগুলোর আয়তন ছিল বিশাল। এ ছাড়া ছিল

প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কক্ষ—মঠে বা আশ্রমে যেমন থাকে। ওই কক্ষগুলোতে থাকতেন এক-একজন পত্নী, তাঁদের দাসীকে নিয়ে। বিশ্রামের জন্য সভাকক্ষ থেকে ফেরার পথে রাজা ওইসব কক্ষের সামনে দিয়েই যেতেন। তখন দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে ভেতরে আসার জন্য ডাকাডাকি করতেন পত্নীরা। তবে তাঁরা কেউই পাটরানী ছিলেন না। নুনিজ লিখেছেন : "ওই রমণীরা ছিলেন সেনাধ্যক্ষ ও অমাত্যদের কন্যা।"

রাজার পত্নীদের জন্য অন্তঃপুরে ছিল অনেক দোলনা। সূর্যাস্তের পর অন্ধকার নেমে এলে অসংখ্য মশাল জ্বালানো হতো—তাতে এলাকাটি দিনের মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। মুক্ত রঙ্গভূমিতেও নিয়ে যাওয়া হতো রমণীদের। সেখানে তাঁরা উপভোগ করতেন মল্লযুদ্ধ ও নৃত্য-গীত ।

মুসলিম হারেম

মুসলিম হারেম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় ১৪শ শতাব্দী থেকে। দাক্ষিণাত্যের গুলবর্গ রাজ্যের অধিপতি ফিরোজ শাহ বাহমিনি ১৩৯৬-৯৭ অব্দে ভীমা নদীর তীরে গড়ে তোলেন এক পাথরের দুর্গ। এর ভেতরে ছিল কয়েকটি মনোরম আঙিনা। খাল কেটে নদী থেকে পানি এনে তা সরবরাহ করা হতো পরস্পর বিছিন্ন ওই আঙিনাগুলোতে। প্রতিটি আঙিনা তিনি নির্ধারিত করেছিলেন তাঁর হারেমের প্রিয় রমণীদের জন্য। বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ওই রমণীদের ব্যাপারে বিশেষ নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছিলে ফিরোজ শাহ। যতদিন বেঁচেছিলেন ওই নিয়মাবলি তিনি পালন করে গেছেন অক্ষরে-অক্ষরে। তবে দুর্গভবনটি আসল হারেম ছিল না তাঁর। কারণ এক দিনে যিনি তিন শ' পত্নী গ্রহণ করেছিলেন তাঁর হারেমের জন্য নিশ্চয়ই কয়েকটি বিশাল অট্টালিকার প্রয়োজন পড়েছিল। ঐতিহাসিক ফিরিশতা উল্লেখ করেছেন : ওই উদ্যানশোভিত দুর্গভবনে স্থান হয়েছিল ফিরোজ শাহের কয়েকজন প্রিয়তমা রানীর শুধু। অমন প্রিয়তমা মোট ক'জন ছিলেন তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে তাঁদের ব্যাপারে তিনি যে বিধিব্যবস্থা চালু করেছিলেন, বিশেষ করে নানা ধরনের প্রতীকচিহ্ন (যেমন, তারকাচিহ্ন) দ্বারা মর্যাদা বা স্থান নির্ধারণের নিয়ম, তা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছিল অন্যান্য ক্ষেত্রেও। ওই আমলের রাজ-কর্মচারীরাও পোশাকে মর্যাদাচিহ্ন লাগিয়ে চলাফেরা করতেন।

মুগল আমলে হারেম

মুগল আমলে জেনানা বিভাগ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সম্রাট আকবরের শাসনকালে এগুলোর অবস্থা কেমন ছিল তার কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে। আবুল ফজল জানিয়েছেন, আকবর এক বিশাল প্রাচীরবেষ্টিত ভবন তৈরি করিয়েছিলেন—যেখানে তিনি প্রায়ই বিশ্রাম নিতেন। তাঁর হারেমে পাঁচ হাজারেরও বেশি রমণী ছিল—যাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত ছিল আলাদা-আলাদা কক্ষ। এতে বোঝা যায়, গোটা সেরাগোলিয়োতে যত জন রমণী কমপক্ষে ততটি কক্ষ ছিল।

ভ্রমণকালে আকবর তাঁর হারেম নিয়ে যেতেন সঙ্গে। যাতে বিপদ-আপদ না হয় সেজন্য হারেম-রমণীরা থাকতো বৃহৎ পরিবেষ্টনীর মধ্য। আবুল ফজল লিখেছেন,

"এটা ছিল ভ্রমণকালে আকবরের এক বিশেষ উদ্ভাবনা"। তবে এই বিবরণ কতখানি সত্য তা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ এ-সম্পর্কে অন্য কারও আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নি। সেরাগোলিয়ো'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নর-নারী ছাড়া অন্য কেউ ওই ভবনে যেতে চাইলে তাকে বিশেষ অনুমতি নিতে হতো। ভবনের চারপাশের ষাট গজ এলাকা ঘিরে রাখা হতো কার্পেটের 'সরপর্দা' দিয়ে। ওই এলাকায় খাটানো হতো কয়েকটি তাঁবু। এগুলোতে থাকতো সেরাগোলিয়ো'র উর্দুবেগি (নারী-প্রহরী) ও পরিচারিকারা।

পর্যটক উইলিয়াম ফিঞ্চ (১৬০৮-১১) মুঘল জেনানার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন সিরহিন্দ শহরে বেড়াতে গিয়ে। রাজ-উদ্যানের যেখানে নুড়িপাথরে নির্মিত দু'টি প্রধান পথ মিলেছে সেখানে ছিল এক অষ্টবর্গ মহল। ওই মহলে রমণীদের জন্য ছিল আটটি কামরা। মাঝখানে ছোটখাটো একটি জলাশয়। কামরাগুলোর উপরে আরও আটটি কক্ষ ছিল—সেগুলোর চারপাশে ছিল চমৎকার দরদালান। আর সবার উপরে ছিল এক মনোরম 'চৌত্রী' বা 'চবুত্র' (চবুতর)—অবসর বিনোদনের স্থান। পুরো ভবনটি ছিল পাথরে নির্মিত—অসংখ্য চিত্র ও মূর্তি দ্বারা শোভিত। এর দু'পাশে ছিল দু'টি জলাশয়। মাঝখানে ছিল আকর্ষণীয় এক চত্বর—পাথরে নির্মিত। চারপাশে ছিল সাইপ্রেস গাছের সারি। অনতিদূরে ছিল আরও একটি মহল, কিন্তু তেমন বিচিত্র কিছু নয়।

সম্রাটের রমণীদের জন্য অনেক প্রাসাদের ভেতরেও নির্মিত হয়েছিল এ-ধরনের ভবন। লাহোরে ছিল এক ছোটখাটো 'দিওয়ানখানা'—মুঘল শাসক রাজকার্য পরিচালনা করতেন সেখানে বসে। এর পেছনেই ছিল তাঁর 'শয়নকক্ষ'। সামনে ছিল প্রশস্ত এক বাঁধানো আঙিনা। এর ডান পাশে ছিল ছোট এক দোতলা মহল—যার প্রতি তলায় ছিল আটটি করে কক্ষ। কক্ষগুলোর চারপাশে ছিল লম্বা বারান্দা। এক দিকের জানালা দিয়ে নদী আর অন্যদিকের জানালা দিয়ে আঙিনা দেখা যেতো। এই মহলের রমণীদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কক্ষগুলোর দরজা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা ছিল বাইরে থেকে। তা হলেও তাদের গোপন প্রণয়ীদের আনাগোনা কখনও বন্ধ করা যায় নি একেবারে। সুযোগ পেলেই তারা রাতের অন্ধকারে বাইরে চলে যেতো অভিসারে, কখনও গোপনে প্রণয়ীদের নিজেদের কক্ষে নিয়ে কাটাতো রাত। লম্বা বারান্দার যেখানে সম্রাটের সিংহাসন পাতা থাকতো, সেখানে রমণীরা প্রায়ই সেজেগুজে ঘুরে বেড়াতো। এর সিলিং ছিল নানারকম চিত্রে শোভিত—যেগুলোকে উইলিয়াম ফিঞ্চ-এর কাছে মনে হয়েছে অত্যন্ত অদ্ভুত। আসলে ওইসব চিত্রের অঙ্কন-কৌশল কিংবা প্রতীকী ব্যঞ্জনা অনুধাবনের ক্ষমতা ছিল না তাঁদের মতো বিদেশীদের।

ফিঞ্চ লিখেছেন : "লম্বা বারান্দার যেখানে সম্রাট বসতেন তার উপরের সিলিংয়ে আঁকা ছিল দেবদূত, অশ্বত্থ গাছ ও দেবদেবীর অসংখ্য ছবি। তবে এই কদাকার চিত্রগুলিকে দেবদেবীর না বলে দানব-দানবীর বলাই ভাল। এগুলোর মাথায় লম্বা-লম্বা শিং, চোখগুলো জ্বলজ্বলে, লোমরাজি দীর্ঘ ও কুঞ্চিত, দাঁতগুলো মূলার মতো, থাবাগুলো কুৎসিত নখরযুক্ত আর লেজগুলো বিশাল। এই বীভৎস চিত্রগুলো দেখে হারেমের অসহায় মেয়েদের ভয় পাওয়ারই কথা।"

মাতোয়ারা সম্রাটকে আরো মাতোয়ারা করার জন্য ব্যস্ত হারেম রমণীরা।

সাবেক দরবার-এলাকার ভেতরে এক ছিল নতুন দরবার। এর চারপাশে ছিল সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা। নতুন মহলের বাঁ পাশে ছিল বিশাল উন্মুক্ত স্থান। মূল দরবার-ভবনে যাওয়ার পথে ডান পাশে ছিল ছোটখাটো এক আঙিনা—সেখানে ছিল আরেকটি চমৎকার মহল। মহলটি নির্মিত হয়েছিল ষোলটি বিশাল বাসভবনকে একত্রিত করে। প্রতিটি ভবনে আলাদা 'দিওয়ানখানা' ছিল, সামনের দিকে ছিল নদীতীর পর্যন্ত বিস্তৃত উদ্যান-আঙিনা। সেখানকার শান্ত মধুর পরিবেশে হারেম রমণীরা সময় কাটাতো চিত্তবিনোদনে।

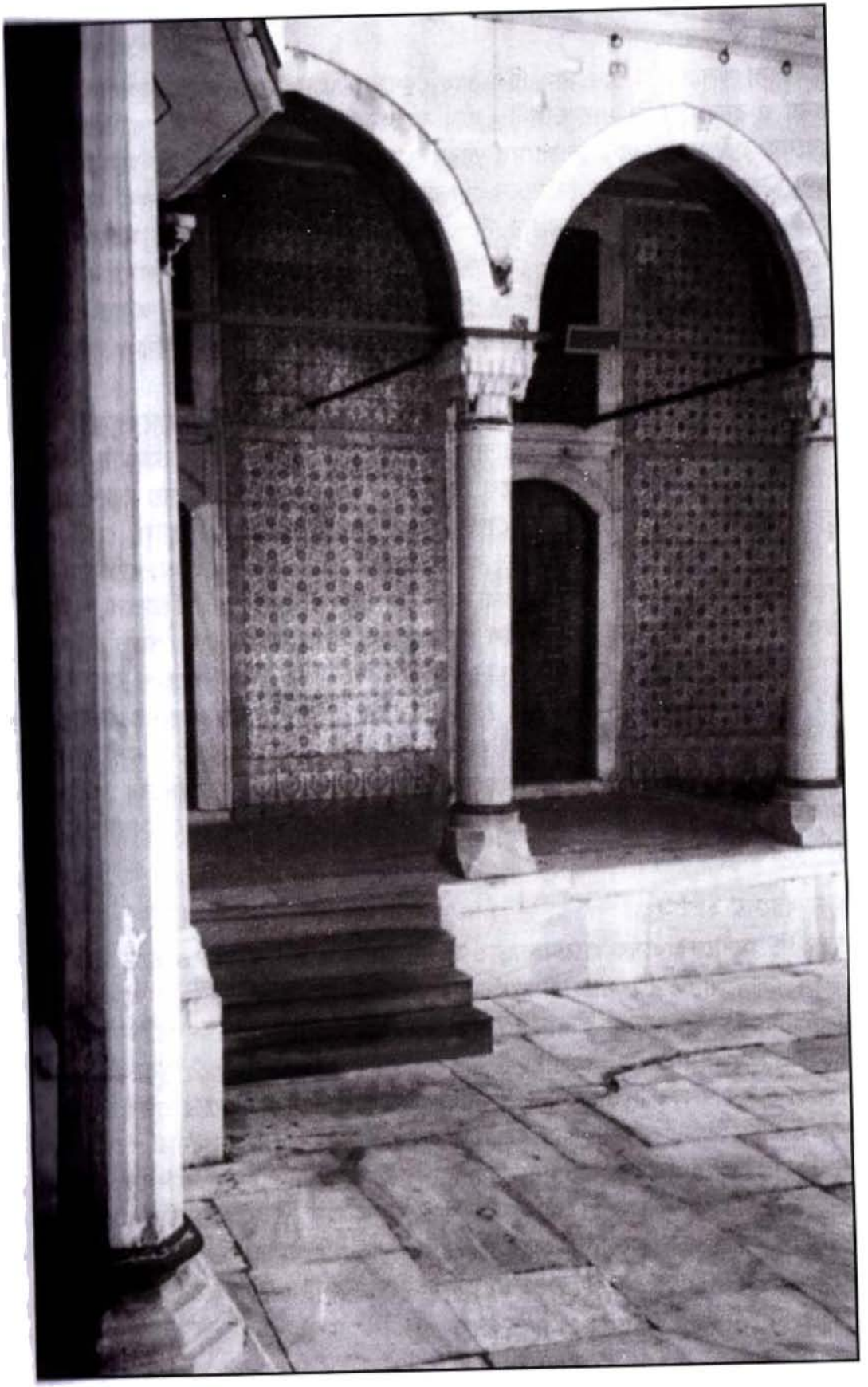

প্রাসাদের হারেম অংশ

মহলের অভ্যন্তরে

শাহজাদা খসরু'র মায়ের নাম ছিল শাহ বেগম। তিনি ছিলেন রাজা ভগবান দাসের কন্যা ও রাজা মানসিং-এর ভগিনী। তাঁর মহলের সামনে ছিল এক উঁচু বাতিস্তম্ভ। এ-ধরনের বাতিস্তম্ভ থাকতো রাজাদের তাঁবুর সামনে। শাহ বেগম যেহেতু সম্রাটকে পুত্র তথা উত্তরাধিকারী উপহার দিয়েছেন সেজন্যেই এমন সম্মাননার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে এটা ছিল হিন্দু ও জৈনদের দীপস্তম্ভ ঐতিহ্যেরই অনুসরণ। এই মহলেও ছিল মনোরম এক দীর্ঘ বারান্দা—সেখানে সম্রাট জাহাঙ্গির মাঝেমধ্যে বসতেন। তাঁর মাথার ওপরে যথারীতি ছিল 'বীভৎস কুৎসিত সব চিত্র'। এই বিবরণটি আরও একবার প্রমাণ করে যে, ভারতীয় চিত্রকলার বিষয় ও রীতি সম্পর্কে উইলিয়াম ফিঞ্চ কত অজ্ঞ ছিলেন।

মহলে ছিল নানা ধরনের আরও অনেক ছবি। রানীদের সঙ্গে রাজাদের ছবি ছিল অনেকগুলো। এ ছাড়া লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তে ছিল বিভিন্ন ভঙ্গিমায় রাজার প্রতিকৃতি—যেমন : রমণীদের মাঝে তিনি বসে আছেন, ওই রমণীদের কারও হাতে সুরাভাণ্ড, কারও হাতে তোয়ালে, কেউ এগিয়ে ধরেছে সুরাভর্তি পিয়ালি, কেউ ধরে আছে রাজার তলোয়ার, কারও হাতে আবার রাজার তীর-ধনুক। এই অস্ত্রধারী রমণীরা সম্ভবত উর্দুবেগি। মুগল আমলে এরা অহদি বা সশস্ত্র নারী প্রহরী হিসেবে পরিচিত ছিল। ওই লম্বা বারান্দার সামনে ছিল পাথর-খচিত প্রশস্ত চত্বর, তার শেষে ছিল মর্মর পাথরে নির্মিত মনোরম ক্ষেত্র। সেখান থেকে যমুনা নদীর দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এর নিচেই ছিল 'প্রমোদ-উদ্যান'। সম্রাট যেখানে বসতেন তার পেছনের দেয়াল ও সিলিং ছিল খাঁটি সোনার প্রলেপে উজ্জ্বল। এর পাশে, এক গজ দূরে, বসানো ছিল মানুষসমান উঁচু তিনটি আয়না। এগুলোর নিচেই ছিল সম্রাট জাহাঙ্গিরের পূর্বপুরুষ আকবর, হুমায়ুন ও বাবরের বিশাল প্রতিকৃতি। তাঁদের পরিধানে 'কলন্দর' বা ফকিরদের মতো পোশাক।

অন্য ধরনের হারেম

রাজকীয় রমণীদের এসব হারেম ছাড়াও প্রভুদের অনুসরণে অমাত্যরাও গড়ে তুলেছিল নিজস্ব সেরাগোলিয়ো। লাহোর দুর্গের পূর্ব দিকের প্রাচীর ঘেঁষে ছিল আসফ খান (জাফর বেগ)-এর প্রমোদ-উদ্যান : ছোট, পরিচ্ছন্ন, বাঁধানো পথের দু'পাশে সাইপ্রেস গাছের সারি, দিঘি ও প্রশস্ত আঙিনাশোভিত। ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়তো চমৎকার এক দিওয়ানখানা—দিঘির মাঝখানে কয়েকটি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। 'শীতল পরিবেশ'-এর জন্য করা হয়েছিল এমন ব্যবস্থা। দিওয়ানখানার পরেই ছিল 'সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত' অন্যান্য দরদালান, বাঁধানো পথ এবং রমণীদের বিভিন্ন বাসস্থান। এগুলোর পেছনে ছিল একটি ছোট বাগান ও বাগানবাড়ি। বাগানের মাঝখানে ছিল এক মনোরম চত্বর। চারপাশে সুরম্য ভবন আর মাঝখানে এক দিঘি—যার চারদিকে উঁচু স্তম্ভের ওপর স্থাপিত লম্বা দরদালান। চত্বরের পরিবেশ তাই সত্যিই ছিল অতুলনীয়।

মহলের বৈশিষ্ট্য

উইলয়াম ফিঞ্চ-এর বিবরণে জানা যায় : মহলগুলো ছিল অত্যন্ত সুপরিসর। তিনি লিখেছেন : "এগুলো এত বড় ছিল যে অন্যভাবে নির্মিত হলে প্রতিটিতে কোনও অভিজাত ব্যক্তি পুরো সংসার সাজিয়ে বাস করতে পারতেন।" এলাহাবাদে ছিল বেলে পাথরের এই বিশাল লাল দুর্গ—আগ্রার দুর্গের অনুরূপ। এর ভেতরে দ্বিতীয় আঙিনায় এত বড় এক মহল ছিল যে তাতে ষোল জন বেগম যাঁর-যাঁর দাসী-বাঁদি নিয়ে ভাগাভাগি করে থাকতেন। দুর্গের মাঝখানে ছিল বাদশার তেতলা ভবন। এর প্রতি তলায় ছিল ১৬টি কামরা। এই ৪৮টি কামরাই ছিল নির্মাণকৌশলে উন্নত এবং বিচিত্র রঙের অদ্ভুত চিত্রাবলিতে শোভিত। একতলার ঠিক মাঝখানে ছিল এক বিস্ময়কর দিঘি।

দিঘি-তীরবর্তী জেনানামহলে ছিল নানা ধরনের প্রশস্ত দিওয়ানাখানা। রমণী সমভিব্যহারে সম্রাট সেখানে প্রায়ই সময় কাটাতেন। মহল ও দিঘির মাঝখানে, প্রাচীর ঘেঁষে ছিল এক মনোরম উদ্যান—সাইপ্রেস ও নানা ধরনের ফলফুলের গাছে সুশোভিত। সেখান থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে দিঘির ঘাটে। ওই পথেই শাহিমহলের জেনানারা প্রমোদ-তরীতে গিয়ে উঠতেন—বিহার করতেন শান্ত দিঘির বুকে।

শাহজাহানের আমলে জেনানা

মুগল সম্রাটরা বিশেষ কিছু রীতি-প্রথা মেনে চলতেন। ফিঞ্চ জানিয়েছেন : জাহাঙ্গিরের আমলে সম্রাটের সিংহাসন পাতা হয়েছিল জেনানা-মহলের সংলগ্ন এক কামরায়। এটাই পরে ঐতিহ্যে পরিণত হয়। শাহজাহানের আমলেও এমন ব্যবস্থা ছিল বলে মানুচ্চি জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "যে-সিংহাসনে সম্রাট শাহজাহান বসতেন সেটা ছিল জেনানা মহলের সামনের এক কক্ষে। এর কারণ দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাত্র কয়েক পা হেঁটেই তিনি সিংহাসনে বসতে পারতেন।"

ওই আমলে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয় নি হারেমের বৈশিষ্ট্যে। মাঝেমধ্যে শুধু দিওয়ানখানার মধ্যে আলাদা-আলাদা কক্ষ সংরক্ষিত করা হতো বেগমদের জন্য। উজ্জয়িনী থেকে চন্দেরী যাওয়ার পথে কয়েকটি বর্গাকার পাথরে নির্মিত মহল দেখেছিলেন ফিঞ্চ। এগুলোর দ্বিতীয় আঙিনার মাঝখানে দু'টি প্রশস্ত কামরা ছিল রমণীদের জন্য। প্রতিটি মহলে ছিল ষোল জন রমণীর থাকার ব্যবস্থা।

বারনিয়ের-এর পর্যবেক্ষণ

হারেমে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হতো শুধু খোজাদের। তাদের কাছ থেকেই বারনিয়ের (১৬৫৬-৬৮) শুনেছিলেন, "মুগল সেরাগলিয়ো অনেক সুসজ্জিত মহলে সুশোভিত; মহলগুলো আয়তনে ছোট-বড় ছিল, সাজসজ্জাতেও তারতম্য ছিল; কারণ বেগমদের মর্যাদা ও আয় অনুসারে এগুলো বরাদ্দ করা হতো।" প্রতিটি মহলের দরজার সামনে ছিল চৌবাচ্চা; আর এর চারপাশে ছিল ফুলের বাগান, মনোরম কুঞ্জগলি, ছায়াবীথি,

ঝরনা, ফোয়ারা, নকল গুহা প্রভৃতি। ওই গুহাগুলো ছিল গভীর ও প্রশস্ত। দিনের বেলায় গরম এড়াতে সেখানে বিশ্রাম নিতো অনেকে, রাতে ঘুমাবারও ছিল আয়েশি ব্যবস্থা। খোজারা স্বর্ণখচিত এক উঁচু অট্টালিকার কথা বলতো প্রশংসার সঙ্গে। যমুনা নদীর তীরবর্তী ওই অট্টালিকা ছিল অনেক দেয়ালচিত্রে সুশোভিত। সেটি ছিল খাসমহল—'পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য', দূরদূরান্তের অতিথিরা সেখানে বেড়াতে যেতেন প্রায়ই।

হারেম-রমণীদের চলাফেরা ছিল নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ মানুষের দৃষ্টির বাইরে রাখা হতো তাদের। দুর্ঘটনাক্রমেও যদি কেউ তাদের কাছে যেতো তাহলে দেখা দিতো প্রাণহানির বিপদ। এ ধরনের আকস্মিক ঘটনা ঘটতো হারেম-রমণীদের শোভাযাত্রার সময়। তখন যদি কোনও অশ্বারোহীকে দেখা যেতো তাদের বড্ড কাছাকাছি, তাহলে তার পদ ও মর্যাদা যা-ই হোক না কেন, রমণীদের পাহারায় নিয়োজিত খোজা ও পদাতিকরা তাকে শাস্তি দিতে কুণ্ঠা করতো না। সেসব শাস্তি ছিল বীভৎস। তবে খোজাদের জন্য ছিল খুব তামাশার ব্যাপার। তাই তারা সবসময় তক্কে-তক্কে থাকতো কোনও হতভাগাকে সুযোগমতো পাওয়া যায় কিনা! বারনিয়ের নিজেও পড়েছিলেন এমন এক বিপদে। তবে তাঁর ঘোড়াটি ছিল অত্যন্ত তেজি। তাই তরবারি চালাতে-চালাতে খোজাদের বেষ্টনী ভেদ করে তীব্র বেগে বেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি। সেকালে সৈন্যদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল : তিনটি ব্যাপার এড়িয়ে চলবে সবসময়—যার একটি হলো জেনানা'র মহিলাদের ত্রিসীমানা!

সপ্তদশ শতাব্দীর জেনানা

সম্রাট যে প্রাসাদ বা দুর্গে থাকতেন তার একদিকে ছিল সেরাগলিয়ো, অন্যদিকে দরবার। নদী থেকে খাল কেটে এনে দুর্গকে কয়েক অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। হারেম সহ অন্যান্য মহলও ছিল এভাবে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। দিল্লির কয়েক মাইল উত্তরে যমুনা নদী থেকে ওই খাল কেটে আনা হয়েছিল বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। কান্দাহারের পারসি শাসনকর্তা আলি মরদান খানের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছিল ওই দুঃসাধ্য খননকাজ।

মানুচচি'র মতো বারনিয়েরকেও নেয়া হয়েছিল হারেমের অভ্যন্তরে, তবে তার আপাদমস্তক ঢেকে দেয়া হয়েছিল কাশ্মিরি শালে—যাতে কিছুই না দেখতে পান তিনি। এক খোজা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল অন্ধ সাজিয়ে। অনেকটা এরকম ব্যবস্থাই ছিল হেকিমদের জন্য—যাঁরা রুগ্ণ রমণীদের চিকিৎসার জন্য যেতেন হারেমে।

শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭) ভারত সফরে এসেছিলেন তাভেরনিয়ের। অমাত্যদের হারেম সম্পর্কে বেশ কিছু বিবরণ নিয়ে গেছেন তিনি। অমাত্যদের বাসভবনের ঠিক মাঝখানে থাকতো জেনানামহল। দু'-তিনটি প্রশস্ত আঙিনা ও দু'-একটি বাগান পেরিয়ে তবেই পৌঁছানো যেতো সেই মহলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর হারেম

রাজ্যের সঙ্কটকালে সেরাগোলিয়ো ছিল এক আশ্রয়স্থল। কোনও আগন্তুকের সেখানে যাওয়া ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রফিউদ্দিন দরজৎ কর্তৃক সিংহাসন দখলের আগে গোলমাল চলছিল বেশ। ফররুখসিয়র তখন লুকিয়ে ছিলেন হারেমে। রফিউদ্দিনের লোকজন খবর পেলেও খুঁজে পাচ্ছিল না তাঁকে। হারেমের সকল বাসিন্দা—বেগম, দাসী ও তুর্কিরা প্রস্তুত ছিলেন হামলা ঠেকাতে। সৈয়দ আবদুল্লাহ বারহা'র ছোট ভাই নাজমুদ্দিন আলি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন আফগান ও তাদের চেলারা এবং 'অন্য কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক' শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়ে প্রাসাদে। দরজা ভেঙে তারা হারেমে ঢোকে, তারপর ফররুখ সিয়রকে খুঁজে পায় ছাদের এক কোণে। তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনে তারা। হতভাগ্য সম্রাটের মা, স্ত্রী, বোন ও অন্য মহিলারা আফগান ও তাদের চেলাদের পায়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন—কিন্তু তাতে কর্ণপাত করে না কেউ। তারা তাঁর দু'চোখ অন্ধ করে দেয়, তারপর বন্দি করে রাখে দুর্গের 'তীরপৌলিয়া'র উপরে এক ঘরে।

শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হতো হারেমে। ১৭১৯ সালে দ্বিতীয় শাহজাহানের পর সিংহাসনে বসেন মাহমুদ শাহ বাদশাহ। উত্তরাধিকারের হানাহানি ব্যাপক আকার ধারণ করে তাঁর রাজত্বকালে। তাঁকে উৎখাত করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। হায়দার কুলি খান ও ইতিমাদ-উদ-দৌলা ব্যাপারটা জানতে পেরে বিশিষ্ট অমাত্য সা'দত খানকে পাঠান সম্রাটের কাছে। সা'দত যখন হারেমে ঢুকতে যাচ্ছেন তখন সম্রাট-মাতা নওয়াব কুদসিয়া এগিয়ে এসে মাতৃস্নেহে বাধা দেন তাঁকে। কিন্তু নিরস্ত হন না সা'দত খান। শত্রুদের সম্ভাব্য হামলা থেকে হারেমবাসীকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি সাহসিকতার সঙ্গে ঢুকে পড়েন ভেতরে। তার আগে অবশ্য মাথা ঢেকে নেন শালে। সম্রাটের কক্ষে গিয়ে সা'দত খান ভক্তি ও আনুগত্যের সঙ্গে তাঁর হাত ধরেন এবং ওই ভাবেই তাঁকে বের করে নিয়ে যান তাঁকে।

জেনানার আয়োজন

হারেম পরিপূর্ণ থাকতো নানা দেশের নানা জাতির রমণীতে। তাদের যাচাই-বাছাইয়ের ব্যাপারটি পুরোপুরি নির্ভর করতো রাজা-বাদশাহর খামখেয়ালের ওপর। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আমলে এই যাচাই-বাছাই চলতো কিভাবে তা জানা যায় না। তবে পরবর্তীকালের অবস্থা দেখে মনে হয় সেকালেও চলেছে একই নিয়ম : সুন্দরী মেয়েদের যোগাড় করা হয়েছে দালাল, উমেদার ও বিদেশী বণিকদের মাধ্যমে, যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে, পিতা-মাতাদের কাছ থেকে কিনে এবং অন্যান্য উপায়ে। হঠাৎ কোথাও দেখে ভাল লেগে-যাওয়া মহিলাদেরও রাজা-বাদশারা নিয়ে এসেছেন হারেমে।

একসময়ে জেনানায় নিয়োগের কাজটি হয়েছে ধর্মীয় পণ্ডিত বা আলেমদের পরামর্শে। গুলবর্গ-এর সুলতান ফিরোজ শাহ বাহমিনি (১৩৯৬-৯৭) সম্পর্কে ফিরিশতা লিখেছেন : 'ধর্মীয় আইন-কানুনের প্রতি' তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তবে 'মদ্য পান করতেন ও সংগীত নিয়ে মেতে থাকতেন'। আইন মেনে চলার ব্যাপারে সুলতান ছিলেন খুবই আগ্রহী। কয়েক জন মোল্লার কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন : ইসলামী আইনে মাত্র চারটি বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে—এই আইন লঙ্ঘন না করে কিভাবে তিনি বহু রমণীভোগের অদম্য স্পৃহা মেটাবেন? এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়। শেষে শিয়া মোল্লারা জানান : সুলতান ইচ্ছা করলে ৩০০টি বিয়ে করতে পারেন। অনুমতি পেয়ে তিনি একদিনেই সে কাজটি করেছিলেন।

বৈচিত্র্যপিয়াসী ফিরোজ শাহের হারেমে ছিল আরব, সারকাসিয়ান, জর্জিয়ান, তুর্কি, রুশ, ইউরোপীয়, চীনা, আফগান, রাজপুতানি, বাঙালি, অন্ধ্র, মারাঠি ও অন্যান্য জাতির নারী। বিশ্বের সকল জাতির নারী যোগাড় করার জন্য তিনি নিয়োগ করেছিলেন বণিকদের। দেশ-বিদেশ ঘুরে তাঁরা সেই 'পণ্য' এনে হাজির করতেন তাঁর সম্মুখে। দেখেশুনে তিনি তাদের বাছাই করে রাখতেন। তারপর মৃত্যু বা অন্য কোনও কারণে রক্ষিতাদের বা তাদের দাসীদের স্থান শূন্য হলে তা পূরণ করতেন তাদের দিয়ে। এই নিয়মটিই চালু ছিল মুগল সম্রাট, শাহজাদা ও অমাত্যদের হারেমে। মানুচচি (১৬৫৩-১৭০৮) লিখেছেন : আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আলমের বার্ষিক আয় ছিল দুই কোটি রুপি, তাঁর মহলে ছিল দুই হাজার রমণী, আর তাঁর দরবার ছিল তাঁর পিতার দরবারের সমান শান-শওকতে পূর্ণ।

শ্রেণীবিভাগ

অন্ত্য বৈদিক যুগের আগে থেকেই সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ ছিল সেরাগলিয়োতে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে : রাজসভার মহিমা বর্ধনকারী দ্বাদশ রত্নের মধ্যে রয়েছেন মহিষী (প্রধান রাণী), ববতা (প্রিয় পত্নী) ও পরিবৃক্তি (পরিত্যক্ত স্ত্রী)। এই বিভাজন থেকে বোঝা যায় রাজকীয় বহুবিবাহ ব্যবস্থায় ছিলেন তিনজন রানী—যাঁদের মধ্যে প্রাধান্য ছিল মহিষীর। এমন ব্যবস্থা চালু ছিল বুদ্ধদেবের সময়েও (পূর্বাব্দ ষষ্ঠ শতক)। কারণ সেকালের এক বিবরণী থেকে জানা যায় : বেনারসের রাজা তম্ব-র হারেমে ছিল ১৬ হাজার রমণী—তবে তাঁর প্রধান রানী ছিলেন সুষোন্দী। বুদ্ধদেব-এর সমসাময়িক উদয়ন পালিয়ে গিয়েছিলেন রাজা প্রদ্যোতের কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে। কৌসম্বীতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি প্রধান রানী করেছিলেন তাঁকে। উদয়নের পত্নী ছিলেন আরও কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে মগন্দিয়া, সমাবতী (কোষাধ্যক্ষের পালিতা কন্যা), গোশকা, গোপাল-মাতা (কৃষক-দুহিতা) প্রমুখের নাম জানা যায়।

এই হিন্দু-প্রথাটি পরবর্তীকালে গ্রহণ করেন মুসলিম শাসকরাও। শামসিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসুদ্দিন আলতমশ দিল্লির সিংহাসনে বসেন ১২১০ অব্দে। তুর্কি ক্রীতদাসী শাহ তুরকানকে তিনি বানিয়েছিলেন খাস বেগম। দান-খয়রাত

করে ওই বেগম পেয়েছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার আসন। জ্ঞানী, গুণী মানুষ, সৈয়দ বংশীয় ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের তিনি আর্থিক সহায়তা করতেন মুক্তহস্তে। কুশ্‌ক্ ফিরেজির প্রধান রাজপ্রাসাদে তিনি বাস করতেন। প্রধান রানী রাখার এই প্রথাটি অনুসরণ করেছিল মুগলরাও। ভারতে মুগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের প্রধান রানী ছিলেন মহম বেগম।

অন্তঃপুরে ক'জন রানী থাকবেন তা নির্ভর করতো রাজার ইচ্ছার ওপর। হিন্দু শাসকরা প্রধান রানীকে পট্টরানী উপাধিতে ভূষিত করে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসাতেন। সাধারণত নিম্নবর্ণের রমণীরা পট্টরানী হতে পারতো না। শ্রীনগরের রাজা চক্রবর্মণ (৯৩৬-'৩৭) হংসী ও নাগলতা নামের দুই ডোম নর্তকীর প্রেমে এতই মজেছিলেন যে তাঁরা যে নিম্নবর্ণের রমণী তা আর মনে রাখেন নি। দু'জনকেই তিনি নিয়ে আসেন হারেমে, তারপর পড়েন তাদের ফাঁদে। হংসীকে চক্রবর্মণ করেন প্রধান রানী। ফলে অন্য রানীদের মতো হংসী-ও রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে পূর্ণ মাত্রায়। তবে এমন মর্যাদার আসন পেয়েও তার স্বভাব-চরিত্রে কোনও পরিবর্তন ঘটে না। মাসিক ঋতুস্রাব ও স্নানের পর সে রক্তমাখা কাপড়চোপড় উপহার দিতো মন্ত্রীদের। আর মন্ত্রীরা 'সগর্বে' সেই স্রাবচিহ্নিত কাপড়চোপড় পরে আসতেন রাজসভায়। এ ছাড়া যারা তার সঙ্গে ভোজনে অংশ নিতো তারা শুধু চক্রবর্মণের নয়, পরবর্তী রাজাদের সভাগৃহেও আসন পেয়েছে। নিম্ন (স্বপক) বর্ণের নারী হয়েও হংসী সাড়ম্বরে মন্দিরে যেতো পূজা দিতে। তার প্রবেশে বাধা দেয়ার সাহস ছিল না কারও। প্রজাসাধারণ বলাবলি করতো : "এ রাজ্যে অপদেবতারাও বাস করতে পারবে না।" তিলদ্বাদশী উৎসবের সময় হংসী যখন রণস্বামীন্ (বিষ্ণু)-এর মন্দিরে যায় তখন কেবল দমর গোত্রের প্রধানরা তাকে প্রণিপাত থেকে বিরত ছিল, কারণ ডোম জাতির হংসী ছিল ওই দমর গোত্রেরই মেয়ে। এই সম্পর্কের কারণে রাজ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে দমররা। তাদের নির্দেশকে রাজাজ্ঞা বলে মেনে নিতো সকলে।

ইতর-প্রকৃতির দমরদের প্রাধান্য ছিল প্রশাসনিক বিষয়াদিতেও। রঙ্গ নামের এক ডোমকে একবার হেলু নামের এক গ্রাম দান করেন রাজা চক্রবর্মণ। কিন্তু রাজসভার দলিল-সংরক্ষক (পট্টোপাধ্যায়) নির্দেশটি পালন করা থেকে বিরত থাকেন। দুর্মুখ রঙ্গ তখন সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, "ওহে দাসের সন্তান, রঙ্গকে লিখে দেয়া হেলু গ্রামের ব্যবস্থা করছিস্ না কেন?" ভীত করণিক আদেশ পালন করেন সঙ্গে-সঙ্গে।

এক স্বপক নারীকে পট্টরানী বানিয়ে চক্রবর্মণ যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা অনুসরণ করেছেন তাঁর অনেক উত্তরাধিকারী। সভাসুন্দরী লুল্লাকে যশস্কর (৯৩৪-'৪৮) উন্নীত করেছিলেন অমন মর্যাদায়, কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। উচ্চ ক্ষমতা ও বিলাস-বৈভব পেয়েও লুল্লা ছিল রাজার প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বস্ত। এক ঝাড়ুদার (চণ্ডাল) প্রহরীর সঙ্গে প্রায়ই গোপন অভিসারে মিলিত হতো সে।

এটি ভারতবর্ষের নয়। শিল্পী এঁকেছেন ভিনদেশের হারেমের ছবি

পট্টরানীরা সাধারণত যাকে-তাকে দেখা দিতেন না। রাজসভার পদস্থ ও প্রভাবশালী অমাত্যরাও অনেক সময় সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে নিরাশ হতেন। ক্ষেমগুপ্ত-এর উত্তরাধিকারী অভিমন্যুর কলঙ্কিত শাসনকালে পট্টরানী ছিলেন দিদ্দা। লজ্জা বা দয়া বলতে কিছু ছিল না তাঁর। পররাষ্ট্র, রাজকীয় আবাস ও অন্যান্য পদে আসীন মন্ত্রীদের তিনি অসঙ্কোচে অনুমতি দিতেন 'তার শয্যাগৃহে প্রবেশের'।

বিধবা নারীদের সহমরণে যাওয়ার মিছিলে নেতৃত্বে দিতেন পট্টরানী। রাজা হর্ষের শ্রীনগরস্থ প্রাসাদ লুণ্ঠিত হওয়ার পর বসন্তলেখা'র নেতৃত্বে ১৭জন রানী সহমরণে যান। তাদের সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন রাজার পুত্রবধূরাও।

দুশ্চরিত্রা রানী-মাতারা নিজেদের ইতর কামনা চরিতার্থ করার জন্য অপরাধমূলক তৎপরতাও চালাতেন। ১০২৮ অব্দে ব্যভিচারী শ্রীলেখা বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন পুত্র

রাজা হরিরজ-র সঙ্গে। তখন ডাকিনী-তন্ত্র প্রয়োগ করে পুত্রকে হত্যার উদ্‌যোগ নিয়েছিলেন তিনি।

উপপত্নী

বৈধ রানী থাকা সত্ত্বেও অন্তঃপুর উপপত্নী রাখার প্রথা চালু করেন হিন্দু রাজারা। কাশ্মীরের রাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১)-এর শাসনকালে দুর্নীতিপরায়ণ শাসক কলষ-এর পুত্র উৎকর্ষ প্রেমে পড়েছিলেন সহজা নামের এক মন্দির-নর্তকীর। মঞ্চে সহজা'র নৃত্য দেখে উৎকর্ষ এতই মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন যে তাকে উপপত্নী হিসেবে স্থান দেন রাজকীয় সেরাগোলিয়োতে।

কাঁচি দিয়ে নিজের ধমনি কেটে আত্মহত্যা করেছিলেন উৎকর্ষ। তার আগে সহজাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্তঃপুরের এক নিভৃত কক্ষে। সেখানে মৃত প্রেমিকের রক্ত সারা দেহে মেখে সহজা সহমরণে যায় পরে। এতে হর্ষ বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু সতী হওয়ার আশায় মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিল সে। অথচ, সহজা যখন সভাসুন্দরী ছিল তখন রাজা হর্ষের প্রিয়পাত্রী হিসেবে নানা সুবিধা ভোগ করতো ইচ্ছামতো।

রাজ্যে যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো তখন তস্করেরা ধনসম্পদ লুণ্ঠনের পাশাপাশি মূল্যবান পোশাক পরা উপপত্নী ও প্রাসাদ-সুন্দরীদেরও ধরে নিয়ে যেতো। এ-ধরনের তস্কর ছিল দমর গোত্রের লোকজন। রাজা হর্ষের প্রাসাদ লুণ্ঠনের সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল একবার। উপপত্নীদের লজ্জা বলতে কিছু ছিল না, নিজেদের ইন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁরা সবই করতে পারতো তারা। রাজা সুস্‌সল (১১২০-২০)-এর শাসনকালে প্রধান সেনাপতি তিলক-এর সৎভাই বিম্ব ষড়যন্ত্র করেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য। পরে ভিক্ষচর (১১২০-২১)-কে 'নামে মাত্র রাজা' বানিয়ে তিনি সকল ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। তবে বিম্ব নিজেও ছিলেন সভাসুন্দরীদের বশীভূত। অবরুদ্ধা নামে তাঁর এক সভাসুন্দরী ছিল অত্যন্ত বেহায়া। রাজা ভিক্ষচরকে প্রায়ই নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতো সে। তাঁকে সে নিজ হাতে রেঁধে খাওয়াতো, তাঁর শয্যাসঙ্গিনীও হতো। প্রধানমন্ত্রী বিম্বের পতন ঘটার পর তাঁর এক উপপত্নীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন ভিক্ষচর। ঘটনাটি নির্লজ্জতা বলে নিন্দিত হয় তখন। ১১৩১ অব্দে লোহরা-র শাসক মল্লার্জুন রাজসভা থেকে সৎ ব্যক্তিদের বহিষ্কার করেন, তারপর সমাবেশ ঘটান বিপুল সংখ্যক সভসুন্দরীর।

ক্রীতদাসী

রাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১) ছিলেন নিতান্তই নির্বোধ। তাই রানী ও উপপত্নীরা ছাড়াও ক্রীতদাসী রমণীরা ভর করতে পেরেছিল তাঁর মাথায়। রাজাকে নানা বিষয়ে মন্ত্রণা দিতো তারা। বলতো, এগুলো দৈব মন্ত্রণা—তাদের মাধ্যমে স্বয়ং ঈশ্বর এই মন্ত্রণা দিচ্ছেন। ক্রীতদাসীদের কেউ-কেউ রাজার সঙ্গে রাত্রিযাপনের জন্য উদ্গ্রীব ছিল। তাদের সে কাম-লালসা তিনি মিটিয়েছিলেন সাগ্রহে।

প্রেম-জীবন

হারেমের অন্তঃপুরে নানা ধরনের অসংখ্য রমণী রাখার উদ্দেশ্য ছিল একটিই—সম্ভোগ। তাদের নিয়ে মদ্যপানের আসর বসানো ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে রানীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন রাজারা। আগে বৃদ্ধা পরিচারিকাদের কাছে জেনে নিতেন রানীর দেহ সুস্থ আছে কিনা। এ-ধরনের নিশ্চয়তা ছাড়া কোনও রমণীর সঙ্গে মিলিত হওয়া ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাজা ভদ্রসেনকে তাঁর ভাই হত্যা করেছিল রানীর শয়নকক্ষে লুকিয়ে থেকে। রাজা করুষকে তাঁর পুত্র হত্যা করেছিল একইভাবে—মায়ের বিশ্রাম-আসনের আড়ালে আত্মগোপন করে। অনেক সময় রানীদেরও বিশ্বাস করা যেতো না। নানা কারণে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হতেন তাঁরা, তারপর তাদের হত্যা করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করতেন। খৈ-মুড়ির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে কাশীরাজ-কে খাইয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। এক জোড়া বিষ-রঞ্জিত নূপুরের সাহায্যে রাজা বৈরন্ত্যে-কে বধ করেছিলেন তাঁর রানী। একইভাবে নিহত হয়েছিলেন সৌবীর, তাঁর স্ত্রী গোপনাঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলেন এক বিষ-পাথর। বিষ-রঞ্জিত দর্পণের সাহায্যে রাজা জলুঠ-কে হত্যা করেছিলেন তাঁর রানী। বিদুরথকে তাঁর রানী হত্যা করেছিলেন কেশগুচ্ছে এক অস্ত্র লুকিয়ে রেখে। এই সাতটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় কেন যৌনাচারের ক্ষেত্রে এত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন রাজারা।

বিপদ ছিল আরও নানা ধরনের। তাই সাধুসন্ত, বিদূষক, পতিতা এবং এমনকি অভিজাত মহিলাদের সংসর্গ থেকে স্ত্রীদের দূরে রাখতেন রাজারা। ব্যতিক্রম ছিল শুধু ধাত্রীদের বেলায়। অবশ্য উপপত্নীরাও থাকতো হারেমে। তবে তারা কাজ করতো স্নান-দাসী, শয্যা-সহচরী, রজকিনী ও মালিনী হিসেবে। পানি, সুগন্ধি, অঙ্গরাগ, পোশাক ও মালা নিয়ে তারা আসতো রাজার কাছে। এগুলো বিষাক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা ছিল। উপপত্নীরা আগে নিজেদের চোখে, হাতে ও স্তনে এগুলো ঠেকিয়ে তারপর রাজার সামনে নিবেদন করতো। এ-ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রে পালন করা হতো কড়াকড়িভাবে। প্রাসাদের বাইরে থেকে এরকম পরীক্ষা ছাড়া ভেতরে ঢুকতে পারত না কোনও কিছু।

রাজরুচি

রানীদের সঙ্গে সঙ্গমলিপ্সু রাজাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন বাৎস্যায়ন (৪র্থ-৫ম শতাব্দী)। কোনও-কোনও সংবেদনশীল রাজা বিশেষ ধরনের ঔষধ ব্যবহার করতেন—যাতে তাঁরা এক রাতে কয়েকজন রমণীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন, তাদের তৃপ্তও করতে পারেন ; যদিও তাঁরা হয়তো অতিকামুক বা উৎকামুক ছিলেন না। কোনও-কোনও রাজা কেবল প্রিয় পত্নীদের সঙ্গই উপভোগ করতেন। আবার কোনও-কোনও রাজা পালাক্রমে পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হওয়া পছন্দ করতেন। পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে যৌনজীবন ছিল এ-ধরনেরই।

কবে কোন রানীর সঙ্গে রাজা রাত কাটাবেন তা স্থির করা হতো বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী। রাজা ও রানীর মিলনের ব্যবস্থা হতো দূতীর মাধ্যমে। প্রত্যেক রানীর থাকতো আলাদা-আলাদা দূতী। দুপুরের নিদ্রা সেরে রাজা যখন গাত্রোত্থান করতেন তখন ওই রাতের জন্য পালাক্রমে নির্ধারিত রানীর দূতী হাজির হতো সহচরীদের নিয়ে। অনেক সময় অন্যান্য রানীর দূতীরাও হাজির হতো ওই দূতীর সঙ্গে। এই দূতীরা রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিতো : অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে কোনও-কোনও রানী পালা অনুযায়ী নির্ধারিত রাতে উপস্থিত হতে পারেন নি—তবে এখন তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন। এরপর সহচরীরা রাজার সামনে নিবেদন করতো বিভিন্ন রানী কর্তৃক আংটির ছাপ দিয়ে পাঠানো মলম ও চন্দন। রানীদের নাম ও এগুলো পাঠানোর কারণ তারা খুলে বলতো রাজার কাছে। তখন রাজা কোনও একটি মলম গ্রহণ করতেন। এই গ্রহণ করার খবর ওই মলম যে-রানী পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে পৌঁছে দিতো দূতী। সেই সঙ্গে দিনে বা রাতের কখন তাঁকে যেতে হবে রাজার কাছে সে-কথাটিও দিতো জানিয়ে।

ষোড়শ শতাব্দীর জেনানা

পূর্বাব্দ চতুর্থ শতকে পণ্ডিতেরা রাজাকে উপদেশ দিয়েছিলেন : "রানীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে তার ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার খবর নেবেন পরিচারিকার কাছ থেকে।" এর এক হাজার বছর পর অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দে নিয়ম হয়েছিল রানীদের সঙ্গে পালাক্রমে মিলিত হওয়ার। কিন্তু এসব রীতি-প্রথা ষোড়শ শতাব্দীর রাজা-মহারাজারা হয় ভুলে গিয়েছিলেন নয় মেনে চলতে অস্বীকার করেছিলেন। কোন রমণীর সঙ্গে রাত কাটাবেন তা তখন নির্ভর করতো তাঁদের খেয়ালখুশির ওপর। বিজয়নগরের প্রখ্যাত সম্রাট কৃষণ দেব রায় (১৫০৯-৩০) একা-একা বাস করতেন প্রাসাদে। কোনও পত্নীর সঙ্গ কামনা করলে তাঁকে ডেকে আনার জন্য তিনি পাঠিয়ে দিতেন খোজা ভৃত্যকে। ভৃত্য অবশ্য হারেমের ভেতর ঢুকতে পারতো না। সম্মুখ-ফটকে নিয়োজিত নারী-রক্ষীর কাছে সম্রাটের নির্দেশ ঘোষণা করতো সে। ওই রক্ষী তখন রানীর কাছে সম্রাটের নির্দেশ বা অভিলাষ ব্যক্ত করতো। তখন রানীর কোনও একজন সহচরী বা পরিচারিকা সরাসরি এসে কথা বলতো খোজা ভৃত্যের সঙ্গে, আর সম্রাটের নির্দেশ জেনে নিতো। এরপর হয় রানী যেতেন সম্রাটের কাছে অথবা সম্রাট নিজে আসতেন রানীর পুরীতে। যথোপযুক্ত সময় বেছে নিয়ে তাঁরা মিলিত হতেন, তবে এই যোগাযোগের খবর 'গোপন' রাখা হতো। গোপনীয়তার কারণ অন্য দুই রানী। তিন পত্নীকেই সমান মর্যাদা দিতেন সম্রাট। কোনও কারণে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা বা বৈরিতা সৃষ্টি হোক তা তিনি চাইতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিন রানী ছিলেন একে অন্যের 'ঘনিষ্ঠ বান্ধবী এবং তাঁরা আলাদা-আলাদা পুরীতে বাস করতেন'। এটা সম্ভব হয়েছিল বিশাল-বিশাল কক্ষবিশিষ্ট প্রাসাদের কারণে।

হারেম যখন আশ্রয়

রাজপরিবারের শিশুসন্তানেরা হারেমেই প্রতিপালিত হতো। বলবন (১২৪৬-৮৭)-এর পুত্র কায়কোবাদ অমিতাচারের কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই দেখে বলবনের প্রবীণ অমাত্য, মালিক, আমির, গোত্রপ্রধান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনয়নের জন্য এক পরামর্শ-সভায় বসেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মনোনীত করেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে, যাকে হারেম থেকে নিয়ে এসে বসানো হয় সিংহাসনে।

সেরাগোলিয়ো সবসময়েই ছিল নিরাপদ আশ্রয়, বৈধ অনুমতি ছাড়া সেখানে কারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। রণথম্বোর অভিযানের সময় আলাউদ্দিন খিলজি শিকারের উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য যাত্রাবিরতি করেছিলেন তিলপৎ নামক স্থানে। ওই সময় তার ভ্রাতুষ্পুত্র আকত খান তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘাতকদল পাঠান, কিন্তু অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান আলাউদ্দিন। ওদিকে তিনি নিহত হয়েছেন অনুমান করে আকত খান সদলবলে হারেমে ঢোকার চেষ্টা চালান। কিন্তু দরজার কাছে তাঁদের বাধা দেন আলাউদ্দিনের দৃঢ় সমর্থক মালিক দিনার ও তাঁর অনুসারীরা। আকত খানকে তিনি বলেন : আলাউদ্দিনের মস্তক না দেখালে হারেমে ঢুকতে দেয়া হবে না।

হারেম ছিল এক ধরনের বিশ্রামকেন্দ্রও। সুলতান যখন শান্তিতে থাকতে চাইতেন তখন চলে যেতেন হারেমে। এক বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে : বিভিন্ন রাজকার্জের বৈধতা ও অন্য বিষয়াদি নিয়ে কাজী মুগিসউদ্দিনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পর আলাউদ্দিন খিলজি কোনও মন্তব্য না করে উঠে পড়েন, তারপর চটিজুতা পরে 'চলে যান হারেমে'।

হারেমকে বিপদ-নিরোধকও মনে করা হতো। 'হাজার-সুতুন'-এ কুতুবুদ্দিন খিলজির ওপর আক্রমণ চালায় পরোয়ারি খুশরু ও ঘাতক দল এবং জহরিয়া ও তার দুর্বৃত্ত সঙ্গীরা। বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার টের পেয়ে তাড়াতাড়ি তিনি চটি পায়ে এগিয়ে যান তাঁর হারেমের দিকে। ওদিকে খুশরু-ও বুঝে ফেলে, সুলতান যদি জেনানামহলে ঢুকে পড়েন তা হলে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

ফররুখসিয়র-এর শেষ দিনগুলোতে (ফেব্রুয়ারি, ১৭৯৯), সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ যখন চরম সঙ্কট সৃষ্টি করে, তখন 'ভাগ্য বিরূপ হয়েছে বুঝে সম্রাট চলে যান জেনানামহলে'।

ওইরকম এক সময়ে হারেম পরিণত হয় দুর্বৃত্তদের লক্ষ্যবস্তুতে। কুতুবুদ্দিন খিলজিকে হত্যার (১৩২৮) পর ঘাতক পরোয়ারি খুশরু রাজকোষাগারের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে, তারপর খুনি সঙ্গীদের নিয়ে 'রাজকীয় হারেমে ঢুকে বীভৎসতায় মেতে ওঠে'। সম্রাটের একদা প্রিয়পাত্র খুশরু নির্লজ্জের মতো বিয়ে করে নিহত প্রভুর পত্নীকে। আর পরোয়ারি বংশীয়রা হঠাৎ ক্ষমতা অধিকারের অহঙ্কারে অমাত্য ও 'অভিজাত' ব্যক্তিদের পত্নী ও পরিচারিকাদের বানায় সেবাদাসী। কুতুবুদ্দিনের উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন দেহরক্ষীদের অনেকেই নিহত হয়েছিল। তাদের পত্নী, পুত্র-কন্যা, উপপত্নী ও

পরিচারিকাদের বিলিয়ে দেয়া হয় পরোয়ারি ও হিন্দুদের মধ্যে। খুশরুকে দমনকারী গিয়াসুদ্দিন তুগলক শাহ এই সব অন্যায়ের প্রতিবিধান করেন। আলাউদ্দিন ও কুতুবুদ্দিনের পরিবার পরিজনদের তিনি খুঁজে বের করেন, যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দান করেন মহিলাদের, সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে দেন আলাউদ্দিনের মেয়েদের এবং কুতুবুদ্দিনের বিধবা পত্নীকে তাঁর স্বামীকে হত্যার তিন দিন পর যারা অবৈধভাবে বিয়ে দিয়েছিল খুশরুর সঙ্গে তাদেরও দেন কঠোর শাস্তি।

১৭২১ অব্দে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন ঘটে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করা হয় দিল্লিতে। ওই সময় তাঁর হারেমের বিপুল সংখ্যক রমণী পড়ে মহাবিপদে। তবে অনেকে গোলযোগের মধ্যেই হাতের কাছে যা পেয়েছে তা-ই ভরেছে বাক্সপেটরায়। শাহি রক্ষীদের আসার আগেই পুরনো পরদা ও চাদরে নিজেদের আবৃত করে তারা দিল্লি ছেড়ে পালিয়ে যায় অনেক দূরে। তবে অভিজাত সৈয়দ বংশীয় রমণীদের অনেকে 'মর্যাদার প্রতীক বোরখায় নিজেদের ঢেকে যার-যার কক্ষেই থেকে গিয়েছিল'।

হারেমে গুপ্তহত্যার চক্রান্তও চলতো। ফিরোজ শাহ তুগলক (১৭শ মুকদ্দমা) যখন সরকারি কার্যব্যবস্থা বিন্যস্ত করছিলেন দিল্লিতে তখন সেখানে মরহুম সুলতান মুহম্মদ তুগলক শাহ-এর এক প্রাসাদে বসবাস করতেন তাঁর কন্যা খুদাবন্দজাদা। সেনাবাহিনীর রসদ বিভাগের অধিনায়ক খুশরু মালিক ছিলেন খুদাবন্দজাদার দ্বিতীয় স্বামী। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর সুলতান ফিরোজ ওই প্রাসাদে যেতেন বেড়াতে। তখন খুদাবন্দজাদার সঙ্গে দেখা হলে তিনি যথাবিহিত সম্মান দেখাতেন তাঁকে। খুদাবন্দজাদাও বিনিময়ে সসম্মানে আপ্যায়ন করতেন সুলতানকে। দু'জনে আলাপ-আলোচনা করতেন পোশাক-কক্ষে বসে। তখন সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন খুশরু মালিক, আর খুদাবন্দজাদার স্বামীর সন্তান দাওয়ার মালিক বসে থাকতো মায়ের পেছনে। আলোচনাশেষে শাহজাদির হাতে পান খেয়ে সুলতান বিদায় নিতেন। এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সুলতানকে হত্যার চক্রান্ত করেন খুশরু মালিক ও তাঁর স্ত্রী।

ওই প্রাসাদে ছিল একটি লম্বা হলঘর—এর দু'পাশে ছিল দু'টি ছোট কামরা। সশস্ত্র ব্যক্তিদের ওই কামরা দু'টিতে লুকিয়ে রাখেন খুশরু মালিক। তাদের নির্দেশ দেন খুদাবন্দজাদা যখন মাথার কাপড় ঠিকঠাক করবেন তখন ছুটে গিয়ে সুলতানের কল্লা কাটতে হবে। ফটকের কাছে এক গোপন ঘরে আরও কিছু সশস্ত্র ব্যক্তিকে লুকিয়ে রাখেন খুশরু। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল প্রাসাদের ভেতর থেকে দৈবাৎ প্রাণে বেঁচে সুলতান যদি বেরিয়ে আসেন তা হলে দেখামাত্র হত্যা করতে হবে। শুক্রবার নামাজের শেষে যথারীতি সুলতান এলেন, আলোচনায় বসলেন। ওই চক্রান্তের সঙ্গে দাওয়ার মালিক জড়িত ছিল না। সুলতানকে দেখে সে তাড়াতাড়ি তাঁকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে। কিছু-একটা ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করে সুলতান সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন। আরও কিছুক্ষণ বসে পান খেয়ে যাওয়ার জন্য খুদাবন্দজাদা পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, কিন্তু

সুলতান বলেন : "ফতেহ্ খান খুব অসুস্থ। কাজেই আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আরেকদিন আসবো বেড়াতে।" প্রধান কক্ষের পাশের দুই কামরায় লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র ব্যক্তিরা যথাসময়ে ইঙ্গিত না পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই ফাঁকে সুলতান বেরিয়ে যান সেখান থেকে। তারপর অপেক্ষমাণ দেহরক্ষী রাই ভীরু ভাট্টি'র তরবারি উঁচিয়ে তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান ফটকের কাছে লুকিয়ে থাকা সশস্ত্র ব্যক্তিদের। এইভাবে সুলতান মুহাম্মদের হারেম থেকে নিরাপদে বেরিয়ে সুলতান সোজা চলে যান স্বীয় প্রাসাদের ঊর্ধ্ব মহল (খুস্ক), সঙ্গে-সঙ্গে ডেকে পাঠান শাহজাদা ও অমাত্যদের। চক্রান্তের খবর পেয়ে তাঁরা তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলেন খুশরু মালিক ও খুদাবন্দজাদার বাসভবন। ভেতর থেকে সশস্ত্র ব্যক্তিদের ধরে এনে জেরা করার পর সবকিছু ফাঁস হয়ে যায়। ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার পর সুলতানের নির্দেশে খুদাবন্দজাদাকে অবসর দেয়া হয়, তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয় মাসিক ভাতা। তাঁর 'অগাধ ধনসম্পত্তি' কুক্ষিগত করাই ছিল খুশরু মালিকের আসল উদ্দেশ্য। কাজেই সেসব বাজেয়াপ্ত করে রাজ-কোষাগারে জমা রাখা হয়। খুশরু মালিককে পাঠানো হয় নির্বাসনে। আর দাওয়ার মালিককে বলা হয়, প্রতি মাসের শুরুতে সে যেন আলখাল্লা ও চটিজুতা পরে এসে দেখা করে সুলতানের সঙ্গে।

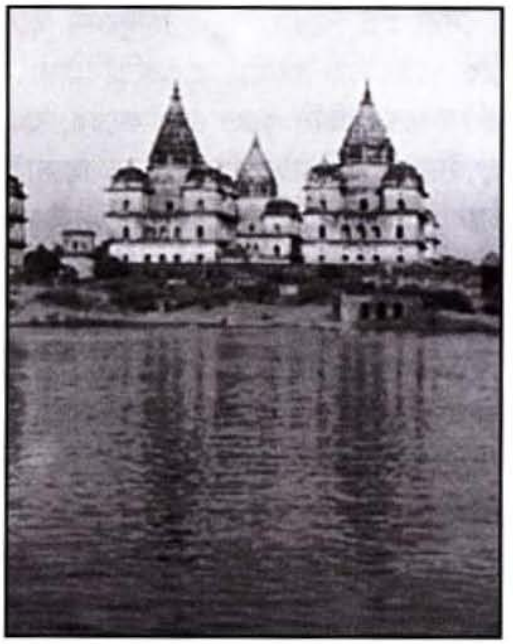

নদীর ওপারে হারেম রমণীদের প্রাসাদ। আরো সুরক্ষিত, আরো নিরাপদ।

খাদ্য ও পানীয়

পর্যটক নুনিজ জানিয়েছেন : হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর (১৩৪৬-১৬৪৬)-এর শাসকরা ও জনগণ গোমাংস ব্যতিরেকে আর সবকিছু খেতেন। গো-পূজা প্রচলিত ছিল বলে তাঁরা কখনও গোহত্যা করতেন না। ভেড়া, শূকর, হরিণ, তিতির, খরখোশ, ঘুঘু, কোয়েল ও সব ধরনের পাখির মাংস খেতেন। নুনিজ লিখেছেন, এমনকি চড়ুই, ইঁদুর, বিড়াল ও টিকটিকি খেতেন সকলে। এ-কথাটি লেখা হয়েছে সম্ভবত জনশ্রুতিকে ভিত্তি করে। কারণ বাজারে উন্নতমানের খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ ছিল প্রচুর। তবে ওইসব প্রাণীও বিক্রি হতো। বাজারে যা কিছু বিক্রি হতো সবই থাকতো তাজা ও টাটকা। 'খুব সস্তা'য় বিক্রি হতো অজস্র ফল : আঙুর, কমলা, জামির, ডালিম, কাঁঠাল, আম প্রভৃতি।

১২টি ভেড়ার দাম ছিল মাত্র এক পরদউ (প্রতপ)। বাইরে পার্বত্য অঞ্চলেও ছিল একই দাম। একটি বিশেষ ঝরনার পানি পান করতেন রাজা। ওই পানির ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতো রাজার বিশ্বস্ত ব্যক্তি। যে-যানবাহনে ওই পানি আনা হতো তা আচ্ছাদিত ও সিলমোহর অঙ্কিত থাকতো। পানির ভাণ্ড তুলে দেয়া হতো প্রাসাদের পরিচারিকার হাতে। সে আবার তা পৌঁছে দিতো রাজার পত্নীদের কাছে।

বিদেশী পর্যটকরা রাজধানী বিজয়নগর (হমপি) সম্পর্কে বলেছেন : 'বিশ্বের সর্বসমৃদ্ধ নগরী'। সেখানে খাদ্যশস্যের কোনও অভাব ছিল না। প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো ধান, যব, দানা, ভুট্টা, বার্লি, মুঙ্গ, ডাল, কলাই প্রভৃতি। রাজধানীর আশপাশেই চাষ হতো এগুলোর। আর বড়-বড় দোকানে বিক্রি হতো 'খুব সস্তা'য়। যব অবশ্য তেমন পাওয়া যেতো না। কারণ ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানরাই শুধু তা খেতো। বাজারে বা রাস্তাঘাটে অসংখ্য গাইগরু ঘুরে বেড়াতো। যাতায়াত করা ছিল মুশকিল। পথিকদের অপেক্ষা করতে হতো কখন ওগুলো রাস্তা পার হয়ে চলে যায়। যাদের ব্যস্ততা থাকতো তারা অন্য পথ খুঁজে ঘুরে যেতো। হাঁস-মুরগির সরবরাহ ছিল প্রচুর। রাজধানীর বাজারে ৩টি মুরগির দাম ছিল ১ *বিনতেম* (১ পয়সার $^{১৭}/_{২০}$)। আর বাইরে একই দামে পাওয়া যেতো ৪টি মুরগি অথবা ৬-৮টি তিতির অথবা ২-৩টি খরগোশ। 'অন্য সব পাখি' ওই একই দামে কত যে পাওয়া যেতো 'তা ক্রেতারা গুণেও শেষ করতে পারতো না'। রাস্তায় অসংখ্য ভেড়া বলি দেয়া হতো প্রতিদিন। বলতে গেলে প্রতিটি রাস্তায় কিনতে পাওয়া যেতো ভেড়ার মাংস। সে মাংস এত পরিষ্কার ও চর্বিযুক্ত যে মনে হতো শূকরের মাংস। কসাইদের বাড়ির সামনের রাস্তায় বিক্রি হতো শূকরের মাংস। সে মাংস এত ধবধবে ও পরিষ্কার যে অন্য কোনও দেশে এর চেয়ে ভাল পাওয়ার আশা করতে পারে না কেউ। ১টি শূকরের দাম ছিল ৪ কি ৫ ফনম (হানা)। নগরীতে প্রতিদিন গাড়ি ভর্তি করে আসতো জামির ও বাতাবি। আরও আসতো টক ও মিষ্টি কমলা, বেগুন এবং বাগানে উৎপাদিত অন্যান্য শাকসবজি। এগুলো আসতো 'এত বিপুল পরিমাণে যে দেখে বেকুব বনে যেতে হতো'। 'রাজধানী নগরী অন্য কোনও শহর-নগরীর মতো ছিল না'। সেখানে ঘাটতি ছিল না কোনও কিছুরই। 'সবকিছুরই ছিল আধিক্য'। সযত্নে পালনের ফলে গরু ও মহিষগুলো ছিল সবল, সুস্থ ও দীর্ঘকায়। আশপাশের কয়েক শ' মাইলের মধ্যে অমন গরু-মহিষ আর দেখা যেতো না। নানা জাতের ডালিম ও আঙুর পাওয়া যেতো। ১০টি ডালিম অথবা ৩ থোকা আঙুরের দাম ছিল ১ ফনম। পাঁঠা ও ভেড়াগুলো আকারে এত বড় হতো যে সেগুলোর পিঠে চরে ঘুরে বেড়াতো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

মুগলদের কাছে গোশত ছিল প্রিয় খাদ্য, তবে শূকরের গোশত ছিল নিষিদ্ধ। সম্রাটকে যাতে কোনওভাবে কেউ বিষ প্রয়োগ না করতে পারে সে ব্যাপারে অবলম্বন করা হতো কঠোর সতর্কতা। পর্যটক ওভিংটন (১৬৮৯) লিখেছেন : আওরঙ্গজেব যা-কিছু খেতেন 'তার স্বাদ আগে গ্রহণ করতো তাঁর কন্যা'। ওই খাদ্য প্রাসাদে আসতো তিনজন প্রধান উমরাও কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার পর। তাতে

তাঁদের সিলমোহর থাকতো। আওরঙ্গজেব পান করতেন গঙ্গা নদীর পানি—প্রাচীন পারস্য রীতি অনুসরণ করে। পারস্যের শাসকেরা ইলোয়াস অথবা চোসপেস নদীর পানি ছাড়া অন্য কোনও পানি পান করতেন না। ওই দু'টি নদী মিলিত হয়ে এখন নাম নিয়েছে কারুন নদী।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের খাদ্য ও পানীয় প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন নুরজাহান। দু'জনের বিয়ে হয়েছিল বিপুল শান-শওকতের সঙ্গে জাহাঙ্গিরের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৬১১)। সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব নুরজাহানের হাতে তুলে দেয়ার পর জাহাঙ্গির প্রায়ই বলতেন : "এক সের মদ আর আধা সের গোশতের বেশি আর কিছু চাই না আমার।" পর্যটক মানুচচি লিখেছেন : নুরজাহান স্বহস্তে মদ পরিবেশন করতেন জাহাঙ্গিরকে। অন্য কেউ পানপাত্র এগিয়ে দিলে তিনি পান করতেন না। তবে নুরজাহানকে জাহাঙ্গির কথা দিয়েছিলেন, দিনে-রাতে নয় পেয়ালার বেশি মদ পান করবেন না তিনি। রাজত্বের দশম বর্ষে (১৬১৫) হাকিম হুমামের পরামর্শে জাহাঙ্গির ছয় পেয়ালা করে মদ পান করতে থাকেন। এভাবে চলেছে ছয় বছর। ওই সময়টা জাহাঙ্গির সারা দিনে খেতেন 'একটি মুরগির গোশত ও কয়েকটা রুটি'।

মুগল আমলে হারেমের রমণীদের মধ্যেও পানাভ্যাস গড়ে ওঠে। এটা ঘটে শাহজাদি জাহান আরা কর্তৃক দৃষ্টান্ত স্থাপনের পর। নানা ধরনের বিনোদন-লীলায় তিনি মগ্ন থাকলেও পারস্য, কাবুল ও কাশ্মির থেকে আনা মদের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দুর্বলতা। তবে নিজের প্রাসাদে যে মদ তিনি চোলাই করতেন সেটাই ছিল সেরা। মানুচচি জানিয়েছেন : মদ, গোলাপপানি, দামি মশলা ও সুগন্ধি ভেষজ মিশিয়ে ওই মদ তৈরি করা হতো। তাঁর চিকিৎসায় হারেমের অনেক রমণী রোগমুক্ত হয়েছিলেন। এজন্যে জাহান আরা মাঝে-মধ্যে কয়েক বোতল করে ওই মদ উপহার পাঠাতেন তাঁকে। মানুচচি লিখেছেন : ওই মদ তাঁর অনেক 'উপকার' করেছে।

রাতের বেলায় গোপনে মদ পান করতেন জাহান আরা। তাঁর চারপাশে তখন জমতো নাচ, গান, ভাঁড়ামি ও ভেলকিবাজির আসর। ধীরে-ধীরে পানের মাত্রা বাড়তো তাঁর। একসময় তা এমন এক পর্যায়ে চলে যেতো যে, কখনও-কখনও তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না, তখন ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হতো বিছানায়। প্রকাশ্যে বা গোপনে পানাসক্ত এমন শাহজাদি ছিলেন আরও কয়েকজন। আওরঙ্গজেবের ব্যাপারে জাহান আরার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় অবতীর্ণ তাঁর ভগ্নি রোশন আরা-ও মদ পান করতেন। দুই বোনের মর্যাদা সমান ছিল না, তবে জাহান আরার তুলনায় রোশন আরা ছিলেন অনেক উদার। এ ছাড়া মদে তিনি ঠিক আসক্ত ছিলেন না, 'পেলেই শুধু পান করতেন'।

যৌনসঞ্জীবনী

মদ্যপানের মতোই প্রকাশ্য ছিল যৌনক্ষমতাবর্ধক ঔষধ প্রয়োগের ব্যাপার। হিন্দু বা মুসলিম শাসকরা এক্ষেত্রেও গোপনীয়তা বজায় রাখার তেমন কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করতেন না। রাজা, রানী, রাজপুত্র, রাজকন্যা ও অমাত্যরা অতিব্যভিচারী

জীবনযাপন করতেন। ফলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে রাজকীয় জীবনের অপরিহার্য সামগ্রী ছিল যৌন সঞ্জীবনী সুরা বা পাচন। কামলীলায় অব্যাহত দক্ষতা বজায় রাখার প্রয়াস রীতিমতো হজুগে পরিণত হয়েছিল সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই।

চরক চিকিৎসা গ্রন্থে (২, ২৮-২৯) উল্লেখ করা হয়েছে : অতিকামুক ব্যক্তিদের শুদ্ধ মাখন, চালের গুঁড়া ও কুমিরের ডিম দিয়ে তৈরী বড়া সেবন করা উচিত। এ-ধরনের উত্তেজনাবর্ধক ঔষধ যে শ' শ' বছর ধরে প্রচলিত ছিল তা বিভিন্ন রাজার বৃত্তান্ত থেকে জানা যায়। কাশ্মিরের রাজা কলষ (১০৬৩-৮৯) যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এক ধরনের মাছের ঝোল (মৎস্য-সূপ) খেতেন। এরকম ঝোল খাওয়ার প্রথা চালু ছিল বলখ-এ, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলেও।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে (১৬৬১-৬২) বলখ-এর এক দূত অনেক উপহার-উপঢৌকন নিবেদন করে তাঁকে। সেগুলোর মধ্যে ছিল এক ধরনের মাছ যাকে চিকিৎসকরা বলতেন মক্কা'র *ইনস্টিনকো*। বলখ-এর কোনও-কোনও ঝরনায় ওই মাছ পাওয়া যেতো। এর ঝোল খেলে ক্লীবত্ব দূর হয় এবং তীব্র কামভাব জাগে বলে বিশ্বাস করা হতো। রিচার্ডসন (অভিধান, ৭০৫)-এর মতে, *ইনস্টিনকো* শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক ভাষা থেকে। এর অর্থ এক ধরনের গোসাপ অথবা বালিতে গর্ত খুঁড়ে বাসকারী কুমিরছানা। যা-ই হোক, মক্কা'র *ইনস্টিনকো* কিছুক্ষণ হাতে রাখলেই নাকি তীব্র কাম-লালসা জাগতো। গোলকোন্ডা'র উজির মির্জা আহমদ একবার বিপুল অর্থ ব্যয় করে মিশর থেকে 'নীলনদের মাছ' আনিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে।

যৌনসঞ্জীবনী ঔষধের প্রতি প্রবল উৎসাহ ছিল সম্রাট শাহজাহানের। প্রিয়পাত্রদের তিনি প্রায়ই পরামর্শ দিতেন এ ব্যাপারে। অনেক সময় নিজেই ঔষধ তৈরি করে তাদের দিতেন। সাইদ খান বাহাদুর জাফর জঙ্গ নামের এক চুগতাই সিপাহশালার ছিলেন নিঃসন্তান। সম্রাট চাইলেন সাইদ খানের এমন অবস্থার অবসান ঘটুক। চিকিৎসকদের তিনি নির্দেশ দিলেন 'তৈমুর-ই-লঙ্গের বৃত্তান্ত' গ্রন্থে উল্লিখিত এক আরক প্রস্তুত করতে। ১১টি উপকরণে প্রস্তুত ওই আরক তিনি নিজে বেশ কয়েকবার সেবন করেছেন এবং 'প্রতিবারই পেয়েছেন চমৎকার ফল'। আরকটি সিপাহশালারের ক্ষেত্রেও বিস্ময়কর ফল দিয়েছিল বলে মনে হয়। চার বছর পর শাহজাহান জানতে চেয়েছিলেন, সাইদ খান এখন ক'জন পুত্রসন্তানের পিতা। এর উত্তর সঙ্গে-সঙ্গে দিতে পারেন নি সাইদ খান, বলেছিলেন—পরদিন এসে জানাবেন। আর পরদিন সম্রাটকে তিনি জানিয়েছিলেন তার এখন ৬০ জন পুত্র রয়েছে, আর কন্যাদের হিসাব এত অল্প সময়ে নিতে পারেন নি। প্রভুর বদান্যতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সাইদ খান বলেন : "জাহাঁপনা, আমার সন্তানেরা আপনার শাহি ফরমানের প্রতি উপহার হিসেবে পেশ হতে প্রস্তুত রয়েছে।" এই প্রস্তাবে অত্যন্ত প্রীত হয়ে সম্রাট তাদের *খানাজাদা* (ভবন-জাত) উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে তারা ওই পরিচয়েই বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। রাজকোষ থেকে তারা উচ্চ পরিমাণে মাসোহারাও পেতো।

শাহজাহানের কাম-লালসা ছিল উদগ্র। ৬৫ বছর বয়সেও (সেপ্টেম্বর ১৬৫৭) তিনি নানারকম সঞ্জীবনী ঔষধ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর বেগম আওরঙ্গবাদীর ছিল দু'জন সুন্দরী দাসী। তাদের নাম ছিল আফতাব (সূর্য) ও মাহতাব (চন্দ্র)। বেগম যখন দেখলেন ওই দুই দাসীর প্রতি সম্রাট আকৃষ্ট হয়েছেন তখন তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য তাদের উপহার দিলেন তাঁকে। একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাহজাহান গোঁফ ঠিক করছেন। তখন আফতাব ও মাহতাব দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর পেছনে। হঠাৎ শাহজাহান খেয়াল করলেন, দু'জনের মধ্যে কি নিয়ে যেন চোখাচোখি হলো। মনে হলো, তারা ভেংচাচ্ছে তাঁকে। এতে মান-সম্মানে আঘাত লাগে তাঁর। এরপর তিনি কয়েক ধরনের যৌনক্ষমতাবর্ধক ঔষধ সেবন করেন দাসীদের সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য। কিন্তু এতে তাঁর মূত্রাশয়ে এমন বিপত্তি দেখা দেয় যে প্রস্রাব বন্ধ থাকে তিন দিন—একেবারে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে যান তিনি। দিল্লিতে ও পরে সাম্রাজ্যের সর্বত্র রটে গেল সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ। শেষ পর্যন্ত অন্য সব ঔষধ প্রয়োগের পর তিনি মুক্ত হন বিপদ থেকে। শাহজাহান যখন শাহজাদা খুররম হিসেবে বিজাপুরে ছিলেন, তখন জুন্নার-এর এক ফকির বলেছিল : "মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আপনি হাতের আপেলের ঘ্রাণ পাবেন না।" সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে যাচ্ছে তিনি জীবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন বুঝে। কিছুদিন পরই মৃত্যু ঘটে তাঁর।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮০৯) সুরজি রাও-এর মতো মারাঠা অমাত্যরা প্রাত্যহিক ভোজনের সঙ্গে মাদকদ্রব্যও গ্রহণ করতেন। তাঁর একটি প্রিয় খাবার ছিল ফলের রসের মোরব্বা ও সাদা রান-পিপীলিকার সঙ্গে বাচ্চা কবুতর ও ছাগলের গোশত রান্না। এ-খাবার খেলে নাকি রতিক্লান্ত ব্যক্তিদের নতুন উদ্দীপনা জাগে। এসব ছাড়াও আফিং, মধু, মা'জুন ও কড়া মদ পান করা হতো অতিরিক্ত যৌন উত্তেজনার জন্য।

আরেক সঞ্জীবনী উপকরণ ছিল জাফরান। বিশেষ-বিশেষ রান্নায় জাফরান (কেশর) ব্যবহার করা হতো সুগন্ধি হিসেবে—এর অন্য কোনও গুণের কারণে নয়। ১৬২৪ অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গির পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন 'জাখারা খেয়ারিজম শাহি' গ্রন্থে উল্লিখিত কথাটি—জাফরান অতিমাত্রায় সেবন করলে মৃত্যু ঘটে, কখনও-কখনও বিপুল হাস্যও উদ্রেক করে—সত্য কিনা। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক কয়েদিকে তিনি নিজের সামনে হাজির করিয়ে প্রথম দিনে ৪০ মিশকাল জাফরান খাওয়ান, পরিদিন খাওয়ান এর দ্বিগুণ পরিমাণ। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না কয়েদির মধ্যে—না হলো সে হেসে খুন, না গেল মারা। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জাহাঙ্গির জানলেন : অতিসূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী ব্যক্তির ওপরই শুধু গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সম্ভবত ওই কয়েদির অমন কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল না।

কেশবিন্যাস

'কুট্টনীমত' গ্রন্থে দামোদর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন : ৮ম-৯ম শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে তিন ধরনের ঐতিহ্যিক কেশবিন্যাস-রীতি প্রচলিত ছিল। বেণি ছিল দীর্ঘ চুলের

বিনুনি—চলাচলের এলোমেলো হয়ে ফুলের থোকা রীতি ছিল থেকেই। এ-কেশবিন্যাস ১১শ পরেও জনপ্রিয় ছিল হারেমে। দ্বিতীয় কেশবিন্যাস ছিল খোঁপা করে অথবা দিয়ে মাথার ওপর মালা (শিখর) কেশবিন্যাসের অজন্তা'র ১৭ নং বিহলন-এর সময়ও ছিল—এর উল্লেখ 'চৌরপঞ্চাশিকা'য়।

হারেম রমণী। শিল্পীর চোখে।

সময় তা জড়িয়ে যেতো। এতে (নির্যূহ) গোঁজার আদিকাল ধরনের ও ১২শ শতকের কাশ্মিরের ধরনের *ধম্মিল্ল*—বড় মাত্র একটি গেরো চুল বেঁধে ফুলের সাজানো। এরকম নমুনা মেলে গুহাচিত্রটিতে। এ-রীতি জনপ্রিয় তিনি করেছেন, তৃতীয় ধরনের কেশবিন্যাসের নাম ছিল *অলক* বা *অলকাবলি*—পেঁচিয়ে কয়েকটি চূড়া করে কপালের ওপর বাঁধা। প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের কেশবিন্যাস এখনও হিন্দু মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয় রয়েছে।

শ্রীনগরে রাজা চক্রবর্মণ (৯৩৬-৩৭)-এর আমলে রাজপরিবারের মহিলারা বেণি করে চুল বাঁধতেন। বিশাল প্রাসাদ-কক্ষে যখন তাঁরা বসে থাকতেন তখন সায়াহ্নের শীতল বায়ু এসে খেলা করতো তাঁদের বেণিতে গোঁজা ফুলের থোকার সঙ্গে—আর সুবাস ছড়িয়ে পড়তো চারপাশে। দুই শতাব্দ পরেও একই ধরনের কেশবিন্যাস মুগ্ধ রেখেছিল তাঁদের। রাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১)-এর রাজত্বকালে 'ভ্রূভঙ্গিতে অস্থির' সভাসুন্দরীরা বেণিতে সাজাতো সোনালি কেতকপাতার অলঙ্কারে শোভিত দীর্ঘ ফুলের মালা। তাদের কপালে দুলতো টিকলি। কাজলের রেখা টেনে চোখের প্রান্ত ও কানকে সংযুক্ত করতো তারা। চুলের গোছার শেষ প্রান্ত বাঁধতো সোনালি ফিতায়। তাদের নিম্নাঙ্গের পোশাক অনেক বেশি ঝোলানো থাকতো—চলার সময় তা ভূমি ছুঁয়ে যেতো। তারা হাসলে চারপাশে যেন কর্পূরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো। আর পুরুষদের সাজসজ্জা ধারণ করার সময় প্রেম-দেবতা কাম-এর প্রতিরূপ হয়ে যেতো তারা।

মুসলিম মহিলাদের কেশবিন্যাস সম্পর্কে জানা ছিল দুষ্কর। তারা পরদা করে চলতো, হিন্দু নারীদের মতো বাইরে আসতো না কখনও। তবে তাদের কেশ ছিল সবসময়েই পরিপাটি, বিনুনি করা ও সুগন্ধি তেলে সুবাসিত।

পোশাক

হারেমে ও বাইরে হিন্দু ও মুসলিম নারীরা পরতো ভিন্ন ধরনের পোশাক। হিন্দু রাজপরিবারের পোশাক ছিল কমবেশি ঐতিহ্যিক : দু'টুকরো বসন-যুগল ও অম্বর-যুগল। উভয় পোশাকই ছিল সেলাইবিহীন। নিচের টুকরো বেঁধে রাখা হতো একটা গেরো (নীবি) দিয়ে। শৌখিন মহিলারা পরতেন নরম, পরিষ্কার ও সুবাসিত কাপড়। চীনা রেশমি কাপড়ের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল গভীর। তরুণী-যুবতীরা রঙিন কাপড় পরতো, কিন্তু বয়সিনীরা ধবধবে সাদা কাপড়ই পছন্দ করতেন। সেলাই-করা পোশাকেরও প্রচলন ছিল। দামোদর গুপ্ত উল্লেখ করেছেন, এরকম পোশাক ছিল দু'ধরনের—কঞ্চুক ঢেকে রাখতো কাঁধ, বগল, স্তন ও পার্শ্বদেশ ; বরবন পরা হতো স্তনের ওপর। মিলনের সময় তা খুলে ফেলা হতো। স্তন ও কণ্ঠহারের মধ্যস্থ বরবনকে সমার্থও মনে করা হতো। সতীত্ব ও শীলতার প্রতীক হিসেবে বিবাহিতা নারীরা পরদা (অবগুণ্ঠন) দিয়ে ঢেকে রাখতেন মুখ।

মুগল রাজপরিবারের বিশেষ করে মহিলাদের পোশাক ছিল 'জাঁকালো ও মহামূল্যবান'। মুগল-শাসিত এলাকায় আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে পোশাক বদল করতে হতো দিনে কয়েকবার। তাঁরা 'এত পাতলা পোশাক পরতেন যে তাঁদের গাত্রত্বক প্রায় স্পষ্ট দেখা যেতো'। তাঁদের পোশাককে তাঁরা বলতেন সিরিকাস (শাড়ি?), অন্য পরিধেয়গুলোকে বলতেন মলমল বা মসলিন। সাধারণ তাঁরা দু'টি, কখনও তিনটি পোশাকও পরতেন ; প্রতিটির ওজন 'আধা ছটাকের বেশি হতো না' ; আর প্রতিটির দাম ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ রুপি পর্যন্ত ; এ ছাড়া পোশাকের ওপর তাঁরা সোনার সুতায় বোনা ফিতা লাগিয়ে নিতেন নিজ হাতে। ওই পোশাক পরে তাঁরা ঘুমাতেন, আর সকালে শয্যাত্যাগ করে তা কোনও দাসীকে দান করে আবার একটি নতুন পোশাক পরতেন।

মুগল মহিলাদের পোশাকরীতিতে এক ধরনের ঐক্য ছিল। নানা আকার ও রঙের এক টুকরা সোনার কাপড়ে তাঁরা মাথা রাখতেন ঢেকে। শীতে ও গ্রীষ্মে পরতেন একই ধরনের পোশাক। বিশেষ করে শীতকালে তাঁরা সকল পোশাকের ওপর পরতেন কাশ্মিরে তৈরী আলখাল্লা ধরনের দীর্ঘ ও খোলা পশমি পোশাক (কাবায়ে)। এ ছাড়া পোশাকের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ করা শাল পরতেন তাঁরা। ওই শালের বর্ণনা দিতে গিয়ে মানুচচি জোর দিয়েই বলেছেন, তা 'এত পাতলা যে সহজেই ছোট একটি আংটির ভেতর দিয়ে টেনে নেয়া যায়'।

সম্রাটের অনুমতি নিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন কোনও-কোনও শাহজাদি। পাগড়ির ওপর আটকানো থাকতো মুক্তা ও মূল্যবান রত্নে খচিত বকপাখি-মূর্তি। ওই 'অতুলনীয় শোভন' সজ্জার কারণে তাঁদের দেখাতো অত্যন্ত মহিমান্বিত। প্রমোদ-উৎসবের সময় এমন সজ্জায় শোভিত হওয়ার অনুমতি নর্তকীদেরও দেয়া হতো।

প্রাত্যহিক পোশাকের ক্ষেত্রে বিজয়নগরের সম্রাটরা যে-রীতি গ্রহণ করেছিলেন তার সঙ্গে অনেক মিল ছিল মুগল শাহজাদিদের। তবে একটি মৌলিক পার্থক্যও ছিল।

সম্রাট অচ্যুত রায় এক পোশাক দু'বার পরতেন না, তবে সে-পোশাক খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তা পাঠিয়ে দিতেন সেই কর্মকর্তাদের কাছে—যাঁরা রাজপোশাক সংরক্ষণ করতেন ও হিসাব রাখতেন। অন্য কেউ যাতে রাজকীয় পোশাক না পরতে পারে সে-জন্যই নেয়া হয়েছিল অমন ব্যবস্থা।

এ ছাড়া পোশাকগুলো ছিল অত্যন্ত দামি, কন্নড়া-পট্টড়-তেলুগু-পট্ট-রেশমি কাপড়ে (পচৌস) তৈরী। অনেকটা সূক্ষ্ম বস্ত্র ও সোনার কারুকাজ করা একালের জরিদার ধুতির মতো। প্রতিটি পচৌস-এর দাম ছিল দশ পরদউ; এর সঙ্গে কখনও-কখনও বজুরি-ও পরা হতো—যা ছিল সম্প্রতিকালের স্কার্ট-সংযুক্ত শার্টের মতো দেখতে। মাথায় সম্রাট পরতেন কিংখাবে বোনা টুপি (কুল্লায়ি), যার দাম ছিল ২০ ক্রুযাদো। ওই টুপি একবার পরার পর আর তিনি মাথায় দিতেন না।

সভাসুন্দরীদের মস্তকাবরণ কেমন ছিল তা সঠিক জানা যায় না। তবে সমসাময়িক পর্যটকদের বিবরণ এবং সেকালের চিত্রকলা, প্রতিমা ও ভাস্কর্য থেকে অনুমান করা যায় যে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে রাজপরিবারের মহিলারা মাথায় কুল্লায়ি-ই পরতেন।

সুগন্ধি, অনুলেপন ও সাজসজ্জা

পূর্বাব্দ পঞ্চম শতকে রাজপারিবারে প্রিয় সুগন্ধির বিবরণ আমরা পেয়েছি। সিটেসিয়াস (পূর্বাব্দ ৪১৫)-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, সে-আমলে এলাচ, স্পাইকেনর্ড (চিরহরিৎ সুগন্ধি চারাগাছ), মারুন, মস্তকি, দারুচিনি, শিলারস, অহিফেনের আরক, সেরিয়াহাতাম, সাইপ্রাস, অ্যাসপ্রালথাস, পানাক্স, জাফরান, সাইপিরুস, মিষ্টি মারজোরাম, জলপদ্ম ও মধু থেকে সুগন্ধি ও অনুলেপন প্রস্তুত করা হতো। এসব সুগন্ধির অনেকগুলোই ব্যবহৃত হতো হিন্দু ও মুসলিম শাসকদের হারেমে—বিশেষ করে কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন ও কস্তুরী। দেশী ও বিদেশী সুগন্ধির প্রতি মহিলাদের দুর্বলতা ছিল বরাবরই। জাফরান, চন্দন কাঠ, কর্পূর ও অ্যানড্রোপোগোন থেকে সুগন্ধি ও অনুলেপন প্রস্তুতের বিবরণ দিয়েছেন দামোদর গুপ্ত। মহিলারা পা ও ঠোঁট রাঙাতেন অলক্তক দিয়ে। ধূপ ও চন্দনকাঠের ধোঁয়ায় পরনের পোশাক সুগন্ধময় করতেন শৌখিন মহিলা ও সভাসুন্দরীরা। মুখমণ্ডলও সুবাসিত (বদন-বাস) করতেন তাঁরা ধূপকাঠি বা *মুখবাসক* জাতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করে। কপালে ও মুখে তাঁরা বিশেষক ও তমালপত্রের তিলক লাগাতেন। দশম শতকের পর থেকে নিজেদের শ্রীমণ্ডিত করে অন্যদের আকৃষ্ট করার জন্য মহিলারা ব্যবহার করতেন ভিন্ন ধরনের সুগন্ধি। সেগুলোর মধ্যে ছিল কর্পূর, ধূপ ও জাফরানের কেশরাগ। কর্পূরমিশ্রিত পান চিবুতেন হারেম-রমণী ও সভাসদরা। চন্দনকাঠ হতে প্রস্তুত অঙ্গরাগ ছিল অতিপ্রিয় সুগন্ধি প্রসাধনীর একটি।

মুগল হারেমে সুগন্ধি

মুসলিম হারেমে নানা ধরনের অতিচমৎকার সুগন্ধির ব্যবহার ছিল যুগের পর যুগ ধরে। যেমন, সম্রাট আকবরের দরবারে অম্বর, মুসব্বর (ঘৃতকুমারী) এবং প্রাচীন গ্রন্থাদির

ভারতবর্ষের বাইরের একটি হারেম

বিবরণ অবলম্বনে আকবরের নিজের উদ্ভাবিত বিভিন্ন সুগন্ধি নির্যাসের প্রচলন ছিল। সোনা ও রুপার বাতিদানে প্রতিদিন আগর জ্বলতো, সুগন্ধি ফুলের সমারোহও ছিল বিপুল। বিভিন্ন ফুলের তেল গায়ে ও চুলে মাখা হতো। উল্লিখিত সুরভির মধ্যে ছিল যবদ, গৌরাহ্, মিদ, উদ, আগর, চুবাহ্, চন্দন, শিলারস, কলম্বক, মালাগির, লুবান, আজফার (উত্তীব), সুগন্ধ-গুগল। অন্যান্য জনপ্রিয় সুগন্ধির মধ্যে ছিল গোলাপের আতর, হেনা ও জাফরান।

গোলাপের আতরকে বিবেচনা করা হতো 'সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি' হিসেবে। মানুচচি লিখেছেন, এর উদ্ভাবক নুরজাহানের মাতা। কিন্তু নুরজাহান নিজেই এর উদ্ভাবক বলে সাধারণত মনে করা হয়। তবে ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য নয়। কারণ অনেক কাল আগেই ক্রেসিয়াস (পূর্বাব্দ ৪১৫) একে উল্লেখ করেছেন কারপিয়ন (গোলাপের নির্যাস) হিসেবে, বলেছেন এর চেয়ে সুমিষ্ট সুবাস পৃথিবীতে আর কোনও কিছুর নেই। একজন ভারতীয় রাজা এই সুগন্ধি উপহার দিয়েছিলেন পারস্যের রাজাকে এবং এর উদ্ভব যে ভারতে তা এখন স্বীকৃত (দ্রষ্টব্য 'আরলি ইন্ডিয়ান ইকোনমিক হিস্টরি' : আর এন সালেতোর, পৃষ্ঠা ২৩৯)। মানুচচি জানিয়েছেন : গোলাপের আতর দিয়ে মুগল শাহজাদিরা নিজেদের সুবাসিত করতেন। ওই সময়ে (১৬৫৩-১৭০৮) এক রুপি মুদ্রার

ওজনের আতর বিক্রি হতো ১৫ রুপি দামে। আগ্রা ও অন্যান্য স্থানে এই আতর পাওয়া যেতো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ছিল অজস্র গোলাপবাগান।

মুগল হারেমে হেনা-ও ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। শাহজাদিরা হাত ও পা রাঙাতেন এই হেনা দিয়ে। দেখলে মনে হতো 'তারা বুঝি দস্তানা পরেছেন'। মেহেদি গাছের পাতা বেঁটে তৈরি করা হতো হেনা।

হিন্দু হারেমগুলোয় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল জাফরান। একে চমৎকার সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করতেন মুগল রমণীরা। থিয়োফ্রেসটাস (পূর্বাব্দ ৩৭২-৮২)-এর আমলে গ্রিসে এই জাফরান রফতানি করা হতো ভারত থেকে। সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। এগুলো উৎপাদিত হতো কাশ্মিরে—বছরে সাধারণত ৪০০ মণ (৩২০০ খুরাসান মণ)। এর অর্ধেক নিতো কৃষকরা, বাকি অর্ধেক জমা হতো রাজকোষে। আধা রতি উৎকৃষ্ট জাফরানের দাম ছিল ১০ রুপি। ওই আধা রতির জন্য লাগতো ৯টি ফুলের গর্ভমুণ্ড ও গর্ভদণ্ড। তাই প্রায় আধা ছটাক (১ আউন্স) জাফরানের জন্য প্রয়োজন পড়তো ৪,৩২০টি ফুলের।

হারেম রমণীদের অলঙ্কার

ভারতীয় মহিলারা বরাবরই কান, নাক, গলা, বাহু, কবজি, আঙুল ও পায়ে অলঙ্কার পরতেন। কানের অলঙ্কার ছিল নানা রকমের : কনক তলী, কাঞ্চন তলী, হেমা-তলী-পট্ট প্রভৃতি। বাহুর অলঙ্কারগুলি কনক-অঙ্গদ, বলয়-কলাপী বা শঙ্খ-কলাপী নামে পরিচিত ছিল। কবজির অলঙ্কার বলয় ও কতক হতো স্বর্ণ-নির্মিত। মহিলারা আঙুলে পরতেন ছোট-ছোট আংটি (বলিকা), কোমরে পরতেন বিছা—বেশির ভাগ সময় বড় ধরনের রশনা বা রৈশনা-গুণ, পায়ে পরতেন নূপুর—চলার সময় তা বাজতো। এসব ঐতিহ্যবাহী অলঙ্কারপত্রের ব্যবহার চলেছে যুগের পর যুগ ধরে।

ষোড়শ শতাব্দীর অলঙ্কার

অমিত ধনসম্পদের অধিকারী হিন্দু রাজাদের পত্নীগণ পরতেন জমকালো অলঙ্কারপত্র। তাঁদের দাসীরা পর্যন্ত অবিশ্বাস্য রকম মূল্যবান অলঙ্কার পরে চলাফেরা করতো। ১৫২০-২২ সালে বিজয়নগরের তিন রানীর প্রত্যেকেরই ছিল 'বিপুল অর্থ ও সম্পদ এবং ব্যক্তিগত অলঙ্কার—যেমন বাজুবন্দ, বলয়, মুক্তাদানা, মুক্তা ও হীরা—সবই অজস্র পরিমাণে'। প্রত্যেকেরই ছিল ৬০ জন করে দাসী, তারাও 'রত্ন অলঙ্কার, চুনি, হীরা, মুক্তা ও মুক্তাদানায় সজ্জিত থাকতো'। এরকম সাজসজ্জা বিশেষভাবে চোখে পড়তো উৎসবের সময়। রাজসভার নর্তকীরাও অজস্র রত্ন, হীরা ও মুক্তার অলঙ্কারে থাকতো ; বিশেষ করে মহানবমী উৎসবের সময়। পর্যটক পায়েস তাই বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছেন : "কত মূল্যবান সম্পদে আবৃত হয়ে ওই মহিলারা চলাফেরা করতেন—তার যোগ্য বর্ণনা দেয়া কি সম্ভব?" তাদের কণ্ঠে হীরা, চুনি ও মুক্তা-খচিত স্বর্ণ-অলঙ্কার,

বাহুতে ও কবজিতে বলয়, কোমরে বিছা এবং পায়ে নূপুর। এসব রত্নসম্পদ পর্যবেক্ষণ করে পায়েস মন্তব্য করেছেন, "বিস্ময়ের অন্য একটি ব্যাপার হলো এমন পেশার রমণীরা এত বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছে।" অনেক নর্তকীকেই ভূসম্পত্তি দান করা হয়েছিল। তাদের দাসীও ছিল অনেক। তারা কি পরিমাণ সম্পদের অধিকারী তার হিসাব নেয়াও ছিল কঠিন। রাজধানী বিজয়নগরে এক খ্যাতিমান নর্তকী ছিল। তার দাম নাকি ছিল ১০,০০০ পরদউ। বিষয়টি অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল বিদেশীদের কাছেও।

মহানবমী উৎসবের সময় নারী-রক্ষীরাও পরতো অনেক জমকালো রত্ন-অলঙ্কার। ন'দিনব্যাপী উৎসবের মহাশোভাযাত্রার দিনটিতে তাদের হাতে থাকতো রৌপ্য-আবৃত দণ্ড, তাদের পাশে-পাশে চলতো দামি ও সূক্ষ্ম রেশমি পোশাকে সজ্জিত মহিলারা। তাদের মাথায় থাকতো কুল্লায়ি নামের লম্বা টুপি—ওই টুপি সাজানো হতো বড়-বড় মুক্তা দিয়ে বানানো ফুলে। তাদের কণ্ঠে শোভা পেতো স্বর্ণ, পান্না, হীরা, চুনি ও মুক্তাখচিত অলঙ্কার। এ ছাড়াও তারা পরতো অনেকগুলো মুক্তার ছড়া ; অন্যরা নগ্ন বাহুতে পরতো বাজুবন্দ, কোমরে পরতো একাধিক বিছা—যার কোন-কোনটি উরুর অনেক নিচে পর্যন্ত ঝুলে থাকতো । অন্য ধরনের রত্ন ও মুক্তামালাও পরতো তারা, হীরা-জহরতে খচিত নূপুরও পরতো। মুক্তাখচিত সোনার পাত্র বয়ে নিয়ে যেতো তারা—যাতে জ্বলতো মোমের প্রদীপ। পায়েস এত বিস্মিত হয়েছিলেন যে শেষপর্যন্ত প্রশ্ন করেছেন, "এই মহিলারা যে-পরিমাণ সম্পদ বহন করছে তার মূল্য নিরূপণ করতে পারে এমন কেউ কি আছে পৃথিবীতে?" বস্তুত ওই রমণীরা এত বলয়, সোনা ও হীরা-জহরত পরতো যে তাদের ধরে-ধরে নিয়ে যেতে হতো সহচরীদের। ভারি অলঙ্কারপত্রে এভাবে সজ্জিত হয়ে তারা রাজকীয় অশ্বগুলোর চারপাশে তিনবার ঘুরে তারপর বিশ্রাম নিতে যেতো প্রাসাদে। অনুষ্ঠানটি আসলে ছিল অশ্বপূজার, যার প্রচলন শুরু হয়েছিল কৌটিল্যের সময়ে (পূর্বাব্দ চতুর্থ শতাব্দ)। ওই রমণীরা ছিল রানীর মর্যাদা-দাসী। ন'দিনব্যাপী উৎসবের প্রতিদিনই তারা স্ব-স্ব রানী ও সহচরীদের সঙ্গে যেতো পূজায়। তারা প্রতিদিন আসতো মহামূল্যবান অলঙ্কারে সেজেগুজে, ওগুলো সহ নিজেদেরকে জনতার সামনে তুলে ধরতো গর্বে ও আনন্দে।

এর দশ বছর পর আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী নুনিজ ওই নারী-রক্ষীদের রাজার পত্নী বলে ভুল করেছিলেন। অশ্বারোহীদের শোভাযাত্রাশেষে আসে 'রাজার ৩৬ জন পরম সুন্দরী পত্নী—স্বর্ণ ও মুক্তার অলঙ্কারে আবৃত হয়ে, প্রত্যেকের হাতে সোনার পাত্র—তাতে জ্বলছে তেলের প্রদীপ'—তাদের সঙ্গে আসে তাদের পরিচারিকারা এবং 'রাজার অন্য পত্নীরা'—যাদের হাতে স্বর্ণদণ্ড ও জ্বলন্ত মশাল। পরে তারা সম্রাটের সঙ্গে প্রাসাদ-অভ্যন্তরে চলে যায় বিশ্রামের জন্য। ওই রমণীরা 'এত বেশি স্বর্ণ ও হীরা-জহরতের অলঙ্কারে সজ্জিত হতো যে তাদের জন্য চলাফেরা হয়ে উঠতো কষ্টকর'। রাজার 'পত্নী' বলে এই উল্লেখ একেবারেই অনুমানভিত্তিক, কারণ তারা সকলেই ছিল নির্ধারিত বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দাসী ও পরিচারিকা।

মুগল শাহজাদিদের রত্ন-অলঙ্কার

হিন্দু রানী ও রাজকন্যাদের মতো মুগল বেগমরাও চমৎকার রত্ন-জহরতে ভূষিত থাকতেন। মূল্যবান চুনিকে তাঁরা সযত্নে রক্ষা করতেন যাতে সেগুলোর ওজন না কমে যায় ; কারণ তাঁরা জানতেন ওই চুনি তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ পরতে পারবে না, আর ওগুলো বিক্রি করে দেয়ারও কোনও প্রয়োজন নেই। এজন্যে চুনি ফুটো করাতে আপত্তি ছিল না তাঁদের। মাথায় রুমাল বাঁধার মতো করে তাঁরা হার পরতেন, আর কাঁধের দু'পাশে পরতেন তিনটি করে মুক্তামালা। সাধারণত তাদের গলা থেকে পেটের নিচ পর্যন্ত ঝুলতো পাঁচটি করে মুক্তা-মালার দু'টি ছড়া। মাথার ঠিক উপর থেকে কপালের মাঝখান পর্যন্ত থাকতে এক থোকা মুক্তা ; তার সঙ্গে শোভা পেতো সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র বা কোনও ফুলের আকৃতিতে নির্মিত মূল্যবান রত্নের অলঙ্কার। এতে তাদের সৌন্দর্য যেন বেড়ে যেতো আরও। ভেনিস থেকে আগত পর্যটক মানুচচিও লিখেছেন, সেই রূপশোভা ছিল 'অতি মনোহর'। মাথার ডান দিকে তাঁরা পরতেন একটি ছোট্ট গোল অলঙ্কার (বউকলে)—তাতে দু'টি মুক্তার মধ্যে আটকানো থাকতো একটি ছোট চুনি। কানেও মূল্যবান রত্ন পরতেন তাঁরা। কণ্ঠে পরতেন বড়-বড় মুক্তার অথবা অতি মূল্যবান রত্নের মালা ; এর ঠিক মাঝখানে শোভা পেতো একটি বড় হীরা, চুনি, পান্না অথবা নীলকান্ত মণি—যার চারপাশ খচিত হতো মুক্তাদানায়।

হারেম-রমণীরা হাতে, কনুইয়ের উপরে পরতেন দু'ইঞ্চি মোটা অনন্ত; তার উপরিভাগ হতো রত্ন-মণিখচিত, আর তা থেকে ঝুলতো মুক্তার নহর। কবজিতে তাঁরা পরতেন মূল্যবান ধাতুতে নির্মিত অলঙ্কার অথবা 'নয় বা বারো প্যাঁচ' দিয়ে মুক্তামালা। এতে তাঁদের কবজি ঢাকা পড়ে যেতো, ফলে মানুচচি'র মতো একজন চিকিৎসকের পক্ষেও মহিলার নাড়ি গণনা হতো কঠিন। আঙুলে তাঁরা পরতেন দামি আংটি। তবে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির আংটিতে রত্ন-পাথরের বদলে থাকতো মুক্তাশোভিত ছোট্ট আয়না। ওই আয়নায় নিজেদের দেখতেন তাঁরা যখন খুশি তখন ; 'নিজেকে দেখা ছিল তাঁদের প্রিয় বিষয়'। তাঁরা 'কোমরবন্দ'ও পরতেন। এর সঙ্গে তাঁরা বেঁধে রাখতেন নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস ; আর এতে শোভা পেতো পাঁচ আঙুল দীর্ঘ মুক্তাছড়ার অনেকগুলো থোকা। গুল্‌ফে তাঁরা পরতেন দামি ধাতুতে নির্মিত মল অথবা দুষ্প্রাপ্য মুক্তার নূপুর। সকল শাহজাদিরই ছিল ছয় থেকে আট কেতা রত্ন-অলঙ্কার, এ ছাড়াও ছিল অন্য ধরনের অন্যান্য কেতা—যা তাঁরা পরতেন খুশিমতো।

সম্রাটের অনুমতি নিয়ে বেগম ও শাহজাদিরা মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। ওই পাগড়িতে থাকতো মুক্তা ও মূল্যবান রত্নখচিত উজ্জ্বল বকপাখি-মূর্তি। এতে তাঁদের দেখাতো অত্যন্ত শোভন, বিদেশীদের চোখেও দেখাতো অপরূপ মহিমান্বিত। মূল্যবান রত্ন বিশেষ করে চুনি ফুটো করায় সেগুলো পুনঃবিক্রয় করা যেতো না সহজে, তারপর আবার দাম দাবি করা হতো অত্যন্ত বেশি। শাহজাদা আকবর যখন মারাঠা রাজ্যে ছিলেন তখন কোষাগারের ঘাটতি মেটাতে পাঁচটি চুনি বিক্রয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন গোয়াতে ; কিন্তু উচ্চমূল্য হাঁকায়, বিশেষ করে সেগুলো ফুটো থাকায়, কোনও ক্রেতাই পাওয়া যায় নি।

রাজকীয় ধনরত্ন সুদীর্ঘকাল ধরে পুরুষানুক্রমে সংরক্ষিত থাকতো মুগল হারেমে। রফিউদ দৌলা (দ্বিতীয় শাহজাহান)-র সংক্ষিপ্ত শাসনকালে, ১৭১৯ অব্দে, আগ্রা দুর্গের পতনের পর তিন-চার শ' বছর ধরে সঞ্চিত ধনরত্ন ও মূল্যবান সামগ্রীর ভাণ্ডার হস্তগত করেন আমীর উল উমরা হুসাইন আলি। ওই বিশাল ভাণ্ডারে সিকান্দার লোদি ও বাবরের সময়কার জিনিসপত্রও ছিল। নুরজাহান ও মমতাজ মহলের যে রত্ন-অলঙ্কারগুলো পাওয়া গিয়েছিল তার দাম ওই আমলেই অনুমান করা হয়েছিল দুই বা তিন কোটি রুপি। ভাণ্ডারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি সামগ্রী ছিল মুক্তাখচিত চাদরের সেট; মমতাজ মহলের সমাধির জন্য ওই সেটটি তৈরি করিয়েছিলেন শাহজাহান। বিবাহ-বার্ষিকীতে ও প্রতি শুক্রবার রাতে চাদরগুলো বিছানো হতো সমাধির ওপর। ভাণ্ডারে আরও ছিল মূল্যবান পান্না ও তামড়ি (গারনেট)-শোভিত এবং স্বর্ণ ও দুষ্প্রাপ্য মুক্তাখচিত একটি হাতলওয়ালা বড় জগ ও একটি কুশন—নুরজাহানের ব্যবহৃত দু'টি প্রিয় সামগ্রী।

বেগম-শাহজাদিদের আদব-কায়দা

বর্ণাঢ্য বেশভূষায় সজ্জিত, হাত ও নখ সুচারুরূপে প্রসাধিত, সুগন্ধিলিপ্ত ও রত্ন-অলঙ্কারশোভিত বেগম-শাহজাদিরা মেনে চলতেন বিশেষ শিষ্টাচার-বিধি। হিন্দু সেরালিয়োর তুলনায় এসব বিধি অনেক কড়াকড়িভাবে পালিত হতো মুসলিম হারেমে। বেগম বা শাহজাদিদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় ঐতিহ্যিক পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রথা ছিল মুগল হারেমে। কর্ণাটক (জিনজি)-এর শাসনকর্তা হিসেবে নওয়াব জুলফিকার খানকে নিয়োগ করেছিলেন আওরঙ্গজেব। দিল্লি থেকে রওনা হওয়ার আগে তিনি বিদায় নিতে গেলেন সম্রাটের এক কন্যার কাছে, কারণ তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ওই শাহজাদির। সৌজন্য-বিধি অনুযায়ী শাহজাদি তাঁকে উপহার দিলেন মূল্যবান রত্নখচিত ও স্বর্ণনির্মিত একটি পানদানি ও একটি পিকদানি। এর এক বছর পর (১৬৯১) ওই শাসনকর্তা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে জিনজি-তে আবার পাঠান পুত্র কাম বকশ-কে তাঁর পিতা উজির আসাদ খানের অধীনে। উজির বিদায় নিতে গেলেন সেই শাহজাদির কাছে, কিন্তু উপহার হিসেবে পেলেন একটি এনামেল-করা রুপার বাক্স! এতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন আসাদ খান। বলেন, তাঁর পুত্র যে মানের উপহার পেয়েছে তিনিও অনুরূপ মানের উপহার পাওয়ার অধিকারী, কারণ তিনি পিতা এবং উজির এবং সাম্রাজ্যে উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। শাহজাদি জবাব দেন, "আপনার পুত্র আমার আত্মীয়, কিন্তু আপনি আমাদের একজন কর্মচারী।" এই সমুচিত জবাবে অভিভূত হয়ে যথাবিহিত সম্মান দেখিয়ে, সম্রাটকে জানিয়ে উজিরের পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি।

বেগম-শাহজাদিদের কাছ থেকে বিদায় নিতে প্রার্থী প্রথমে হাজির হতেন মহলের দরজায়, সেখানে কর্তব্যরত খোজা প্রহরীকে জানাতেন আগমনের কারণ, অনুরোধ করতেন যথাজনের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে। ওই খোজা প্রহরীরাই বার্তা নিয়ে যেতো

আবার জবাব নিয়ে আসতো। কারণ মহিলারা স্বামী ও চিকিৎসক (যাঁরা শুধু নাড়ি পরীক্ষা করতে পারতেন) ছাড়া আর কাউকে দেখা দিতেন না। ঢাকা পালকিতে চড়ে তাঁরা অবশ্য বাইরে যেতেন, তবে ওই পালকির জানালায় থাকতো সোনার সুতায় বোনা জাল—যা দিয়ে তাঁরা বাইরের সবকিছু দেখতে পেতেন, কিন্তু বাইরে থেকে তাঁদের দেখা যেতো না। পরদার এমন কড়াকড়ি কিন্তু হারেমে ছিল না, সাধারণ হিন্দু পরিবারে মেয়েরাও এমন পরদা করতো না।

পথিমধ্যে কোনও বেগম-শাহজাদিকে সালাম জানাতে চাইলে অমাত্যরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়তেন অথবা পথ থেকে সরে যেতেন দূরে, তারপর অভিবাদন জানাতেন। মহিলারা যদি মনে করতেন ওই ব্যক্তি যথেষ্ট উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী তা হলে পালকি থেকে খবর পাঠাতেন আরও কাছে এগিয়ে আসার জন্য, সম্মান দেখাতে নিজেদের পালকিও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে থামাতেন। এরপর আবার চলা শুরু করার সময় সন্তোষ ও বিদায় জানানোর নিদর্শনস্বরূপ খোজার মাধ্যমে কয়েকটি পান-পাতা পাঠিয়ে দিতেন। এই উপহার গ্রহণ করে অমাত্য আবার অভিবাদন জানাতেন, তারপর নিজের পথে চলতে শুরু করতেন।

দৈবাৎ যদি পথে কোনও অমাত্য তাঁর লোক-লশকর সহ কোনও শাহজাদির শোভাযাত্রার মুখোমুখি হয়ে পড়তেন, তা হলে 'দরবারের নেপথ্য নায়িকাদের কৃপা পাওয়ার আশায় উদগ্রীব হতেন'—কারণ তাদের মাধ্যমেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পন্ন হয়। সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে তিনি রাস্তা থেকে সরে যেতেন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে দু'হাত আড়াআড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকতেন প্রায় দু'শ' কদম দূরে। পালকি কাছে এলে ঈষৎ নত হয়ে অভিবাদন জানাতেন, প্রকাশ করতেন সম্মান-বিনিময়ের আশা। শাহজাদি যদি সম্মান দেখাতে চাইতেন তা হলে মূল্যবান রত্নে খচিত ও সোনার জরিতে বোনা থলেতে কয়েক গুচ্ছ পান-পাতা পাঠিয়ে দিতেন উপহার হিসেবে। ওই সৌজন্য-উপহার গ্রহণ না করা ছিল চরম অশিষ্টতা, শাহজাদি তখন তাঁকে চাবুক মারার নির্দেশ দিতেন। প্রাণ নিয়ে ছুটে পালানোর পূর্ব পর্যন্ত ওই চাবুক চলতো! শাহজাহানের মহলে সর্বাধিক মর্যাদা ছিল বেগম সাহেবা (জাহান আরা)-র, কারণ পিতার কাছ থেকে তিনি যা খুশি করার অধিকার পেয়েছিলেন।

হারেমের সংগঠন

পূর্বাব্দ ৬ষ্ঠ শতক থেকেই রাজা-মহারাজাদের হারেম একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান। এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের দফতর ছিল আলাদা। রাজসভা এবং যুবরাজ ও তত্ত্বাবধায়কদের দফতরের মধ্যবর্তী স্থানে হারেমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাহিনী মোতায়েন থাকতো। হারেমের ভেতরেও ছিল উচ্চ ও নিম্নস্তরের অসংখ্য কর্মকর্তা—যাদের কাজ ছিল রানী ও রাজকন্যাদের চাহিদা মেটানো। যেমন, কোনও রানীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের আগে রাজা তার শারীরিক সুস্থতার বিবরণ শুনতেন বৃদ্ধ পরিচারিকার মুখে। স্নান করে শুদ্ধ এবং নতুন পোশাক ও রত্ন-অলঙ্কারে শোভিত হয়ে

রূপাজীবা বা বেশ্যারা উপস্থিত থাকতো অন্তঃপুরে। হারেম-রমণীদের শুদ্ধতা প্রতিপন্ন করার জন্য ৮০ জন পুরুষ ও ৫০ জন নারী নিয়োজিত থাকতো পিতা, মাতা, প্রবীণ ও খোজা হিসেবে। রাজার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করতো তারা। হারেমের ভেতরে সবাইকে নির্ধারিত স্থানে বাস করতে হতো, অন্যের জন্য নির্ধারিত স্থানে তাদের প্রবেশ করা চলতো না। বাইরের কোনও ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা ছিল তাদের জন্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ। অবাঞ্ছিত বা নিষিদ্ধ কোনও সামগ্রী যাতে হারেমে কেউ না আনতে পারে কিংবা হারেম থেকে না নিয়ে যেতে পারে সে-ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। এই নির্দেশটি বিশেষভাবে বাস্তবায়িত হরা হয়েছিল আওরঙ্গজেবের আমলে—হারেমের আলোক-ব্যবস্থার সূত্রে। অন্তঃপুর থেকে বাইরে কিংবা বাইরে থেকে অন্তঃপুরে কোনও সামগ্রী আনা-নেয়া ছিল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত : সেগুলোকে বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রাজকীয় সিল(মুদ্রা) মারার পরই শুধু সরবরাহ করা হতো উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে।

বিভাগীয় প্রধান

আদিকাল থেকেই অন্তঃপুর ছিল একজন সুযোগ্য কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণাধীন। 'মহাভারত-এ এ-ধরনের কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে অন্তর্বেশিক অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক। এ-ধরনের কিছু কর্মকর্তা সম্পর্কে মন্তব্য রেখেছেন কৌটিল্য (পূর্বাব্দ ৪র্থ শতক)। প্রথম স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল অন্তর্বংশিক বা হারেম-পরিচালক—যার বার্ষিক বেতন ছিল ২৪,০০০ পণ ; একই হারে বেতন পেতো দ্বাররক্ষী, অধিনায়ক (প্রশাস্ত্রী), সংসার-সরকার ও কর-অধ্যক্ষ। নিম্নস্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিল বেশ্যাদের পরিচালক (গণিকাধ্যক্ষ) ; রাজার অন্তঃপুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। এই ঐতিহ্য চালু ছিল শ' শ' বছর ধরে—মুগল আমল পর্যন্ত। সোমদেব (১২শ শতক) উল্লেখ করেছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গদেশের বর্ধমান নগরীতে সুরখিতা নামের এক মহিলা ছিলেন নারী নিবাসের পরিচালিকা ; ওই নিবাসে একমাত্র তিনিই প্রবেশ করতে পারতেন, কারণ এর চারপাশে কড়া পাহারা দিতো সান্ত্রিরা। এই কর্মকর্তা অন্য কেউ নয়—সেই অন্তর্বেশিকা। অশোক-এর উৎকীর্ণ লিপিতে *স্ত্রীঅধ্যক্ষ*, আর তাঁর অনুশাসনে *ইত্থিঝক মহামাত্রা* বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁকে।

মুসলিম হারেমে এ-ধরনের বিভাগীয় প্রধান ছিল একজন সুপরিচিত কর্মকর্তা। ইতিহাসের পাতায় অনেক কাহিনী লেখা আছে এদের সম্পর্কে। বলবন-এর পুত্র কায়কোবাদের শাসনামলে দাদ-বাক (বিচার বিভাগের মুখ্য প্রশাসক) ও নায়েব-উল-মুলক (রাজ্যের উপ-শাসক) নিজামউদ্দিনের পত্নী এত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁকে সুলতানের ধর্ম-মা ও নারী-নিবাসের পরিচালিকা হিসেবে গণ্য করা হতো। এ-ধরনের নিয়োগ মুগলরাও অব্যাহত রেখেছিল। আকবরের আমলে বুদ্ধিমত্তা বিচারবুদ্ধি ও আন্তরিকতার জন্য বিশিষ্ট মহিম আঙ্কা-কে সম্বোধন করা হতো 'সতী-শিরোমণি' বলে; রাজকীয় হারেম ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তবুও নির্বুদ্ধিতার জন্য পুত্র আদম খানের কূট চক্রান্তের শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাঁকে।

অন্যান্য কর্মকর্তা

পূর্বাব্দ চতুর্থ শতকে অন্তঃপুরের প্রথম কক্ষে গাত্রোত্থানের পর রাজাকে অভ্যর্থনা জানাতো তীর-ধনুকে সজ্জিত নারী-রক্ষীরা। প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতো কঞ্চুকী (রাজার পোশাক ও উষ্ণীষ উপস্থাপনকারী) ও অন্যান্য হারেম-পরিষদ। তৃতীয় কক্ষে তাঁর সামনে উপস্থিত হতো কুঁজো ও বেঁটে লোকজন, জ্ঞাতিবর্গ ও দ্বাররক্ষীরা—তাদের হাতে থাকতো কাটা ভল্ল। বিদেশাগত আগন্তুক, শত্রুভাবাপন্ন তৎপরতায় নিয়োজিত স্বদেশীয় ও বিশ্বস্ততার জন্য পুরস্কৃত নয় এমন কেউ কখনও রাজার দেহরক্ষী হতে পারতো না, হারেমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাহিনীতেও যোগ দিতে পারতো না।

হিন্দু অন্তঃপুরে নর্তকীরা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ আনুষঙ্গিক। তারা থাকতো একজন পরিচালক (গণিকাধ্যক্ষ)-এর কর্তৃত্বাধীন। পদমর্যাদায় ওই পরিচালকের স্থান ছিল বলিদানকারী পুরোহিত (ঋত্বিক)-এর পরেই। তার বার্ষিক বেতন ছিল ৪৮,০০০ পণ; এর অর্ধেক অর্থাৎ ২৪,০০০ পণ পেতো দ্বাররক্ষী, সেনা-অধিনায়ক (প্রশাস্ত্রী), কর-অধ্যক্ষ ও সংসার-সরকার (সন্নিধাতা)। বেশ্যা-পরিচালককে ১০০০ পণ বার্ষিক বেতনে বেশ্যা (গণিকা) নিয়োগ করতে হতো রাজসভার জন্য। ওই বেশ্যা কোনও বেশ্যার পরিবারে জন্মেছে কিনা সেটা বিচার্য ছিল না, দেখা হতো সে অসামান্য সুন্দরী, তরুণী ও সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন কিনা। পরিচালককে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বেশ্যা (প্রতিগণিকা)-ও নিয়োগ করতে হতো অর্ধেক বেতনে (কুটুম্বর্ধেণ)। হিন্দু হারেমে এই বেশ্যাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। তারা রাজচ্ছত্র, স্বর্ণঘট ও রথের পাশে বসতো। তাদের সমারোহকে আরও দীপ্তিশীল করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, সৌন্দর্য ও রত্ন-অলঙ্কারের পরিমাপ অনুযায়ী তাদের ভাগ করা হয়েছিল উচ্চ, মধ্যম ও সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। ওই হিসেবেই তাদের বেতন ধার্য করা হতো হাজার-হাজার পণ।

ভারতীয় লোককাহিনীতে রাজার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ও হারেমের কিছু-কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। *পঞ্চতন্ত্র* (৪র্থ শতক)-এ তাঁতি ও রাজকন্যার প্রেম-উপাখ্যানে বর্ণিত আছে কিভাবে একদিন নারী-নিবাস (কন্যান্তঃপুর)-এর প্রহরী (রক্ষপুরুষ)-রা দেখতে পায় প্রেমিকের সঙ্গে রাজকন্যার গোপন মিলন। প্রাণভয়ে তারা রাজার কাছে নিবেদন করে: "হে রাজন! ক্ষমাশীল হয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করুন। একটি গোপন সংবাদ আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি।" রাজা সম্মতি জানালে প্রহরীরা বলে: 'হে রাজন! হারেমে যাতে কোন পুরুষ প্রবেশ করতে না পারে সে-ব্যাপারে আমরা খুবই সতর্ক। কিন্তু, রাজকন্যা একজন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল রাজাই পারেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে।"

সেকালের লোককাহিনীতে হিন্দুরাজসভার কোনও-কোনও হারেম-কর্মকর্তার উল্লেখ করা হয়েছে মাঝে-মধ্যে। কর্ণাটকের রাজা পরমন্দি'র সুন্দরী রানী চন্দ্রলেখা'র এক সামান্য পটচিত্র শ্রীনগরের রাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১)-কে রীতিমতো মোহাচ্ছন্ন

শুধু যৌনতা নয়, সঙ্গীতও ছিল হারেমের অংশ। সঙ্গীতের ধরন অবশ্য আমরা অনুমান করে নিতে পারি। শিল্পীর আঁকা।

করেছিল, তাঁর সৌন্দর্য পানের পিপাসায় প্রায় উন্মাদ হয়ে যান তিনি। রক্তমাংসের চন্দ্রলেখাকে যেহেতু পাওয়ার কোনও উপায় ছিল না তাই তার এক মূর্তি গড়ে নেন হর্ষ, আর জঘন্য প্রকৃতির প্রধান সেনাপতি মদন-কে করে দেন ওই মূর্তির সংসার-সরকার। মদন-এর কাজ শুধু মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণ ছিল না, তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারপত্র যোগাতেও হতো তাকে। এজন্য রাজকোষ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাতা নিতো সে। এমন অপচয় সে-আমলেই নিন্দিত হয়েছে মদন-এর শঠতা এবং হর্ষ-এর মূর্খতা ও পাগলামি বলে।

হিন্দু ও মুসলিম হারেমে নর্তকী ও বেশ্যাদের ছিল অপরিহার্য অবস্থান। প্রশাসনের সঙ্গে তারা ছিল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পূর্বাব্দ চতুর্থ শতকে, প্রত্যেক বেশ্যাকে তিনটি ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করতে হতো বেশ্যা-তত্ত্বাবধায়ক (গণিকাধ্যক্ষ)-এর কাছে ; তার দৈনিক পারিশ্রমিক (ভোগ)-এর পরিমাণ, ভবিষ্যৎ-উপার্জন (আয়তি) এবং নিয়মিত প্রণয়ীদের পরিচয়। ভবিষ্যৎ-উপার্জন সম্পর্কে কিভাবে তথ্য দেয়া হতো তা

অবশ্য অনুমান করা কঠিন। এ-ধরনের নির্দেশ ছিল নট-নটী, গায়ক-গায়িকা, বাদ্যযন্ত্রী, ভাঁড় (বাগ্‌জীবন), হরবোলা (কুশীলব), দড়িবাজ (প্লবক), ভোজবাজিকর (শৌভিক), চারণকবি, বেশ্যার দালাল ও অসতী নারীদের ওপরও। হারেম-রমণীদের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগ ঘটতো এদের। কারণ তাঁরা গান-বাজনা, খেলাধুলা প্রভৃতির আসর বসাতেন হারেমে। অপরাধী ও বিদেশী গুপ্তচরের সন্ধান পাওয়ার জন্যও বেশ্যাদের কাজে লাগানো হতো অনেক সময়।

এ ছাড়া রাজস্বের এক উৎসও ছিল নর্তকী ও বেশ্যারা। প্রত্যেক বেশ্যার উপার্জন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ, আয়-ব্যয় ও ভবিষ্যৎ-উপার্জনের হিসাব রাখতেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। কোনও বেশ্যা কিছু স্বাধীনতাও পেতো। যদি সে রাজসভা থেকে বিদায় নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে চাইতো তা হলে অনুমতি মিলতো সহজেই। এজন্যে মাসে ১.২৫ পণ খাজনা দিতে হতো তাকে। তাদের জরিমানা করেও অনেক সময় রাজস্ব আদায় করা হতো। যেসব অন্যায়ের জন্য জরিমানা হতো সেগুলো হচ্ছে : যদি কোন বেশ্যা তার রত্ন-অলঙ্কার তার মা ছাড়া অন্য কাউকে দিতো তা হলে জরিমানা হতো ৪.৫০ পণ, যদি সে তার সম্পত্তি (স্বপত্যেম) বিক্রি করতো বা বন্ধক দিতো তা হলে জরিমানা ৫০.৫০ পণ ; কারও মানহানি করলে জরিমানা ২৪ পণ; কাউকে আঘাত করলে ৪৮ পণ ; কারও কান কেটে নিলে ৫০.২৫ পণ ও ১.৫০ পণ (এরকম নির্ধারণ হতো কিসের ভিত্তিতে তা স্পষ্ট নয়)। এসব ছাড়াও প্রত্যেক বেশ্যা (রূপাজীবা)-কে মাসিক খাজনা দিতে হতো ; ওই খাজনার পরিমাণ ছিল তার দৈনিক উর্পাজনের দ্বিগুণ (ভোগদ্বিগুণম)। নর্তকী ও বিদেশী ব্যক্তিদের অনুজ্ঞা বেতন (লাইসেন্স ফি) দিতে হতো, এ নিয়ম বেশ্যাদের বেলায়ও প্রযোজ্য ছিল অনুমান করা যায়।

এসব প্রথার অনেকগুলিই চালু ছিল শ' শ' বছর ধরে। বিজয়নগর রাজ্যে নর্তকী ও বেশ্যাদের খাজনা দিতে হতো সরকারকে। পারস্যের রাষ্ট্রদূত আবদুর রাজ্জাকের বিবরণী থেকে জানা যায়, বিজয়নগরের সম্রাট দ্বিতীয় দেব রায়ের ১২ হাজার পুলিশের বেতন যোগাতো পতিতালয়গুলো। এ-বিবরণ ১৪৪২ অব্দের। সপ্তদশ শতকের গোলকোণ্ডায় বেশ্যাদের দিতে হতো অনুজ্ঞা বেতন।

নারী কর্মচারী

বিজয়নগর-সম্রাটের সেবায় প্রাসাদে নিয়োজিত ছিল প্রায় ৬০০ নারী ও খোজা। সম্রাটের মতো সম্রাজ্ঞীদের সেবায়ও নিয়োজিত থাকতো তাঁদের নিজস্ব কর্মচারী, তবে তারা সকলেই ছিল নারী। সব মিলিয়ে চার হাজারেরও বেশি নারী বসবাস করতো প্রাসাদে। তাদের অনেকে ছিল নর্তকী, অনেকে ছিল বাহিকা—তারা কাঁধে করে বহন করতো সম্রাজ্ঞীকে ; এ ছাড়া ছিল কুস্তিগির, জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ, হিসাবরক্ষক, বার্তালেখিকা, সংগীতবিদ, বাদ্যযন্ত্রী ও গায়িকারা। একইভাবে মালাবার রাজ্যে (করমণ্ডল উপকূল) রাজার হারেমে যে এক হাজার সভাসুন্দরী ছিল তাদের অনেককে

নিয়োজিত করা হয়েছিল হারেম-সরকার, দোভাষী, সুরা-সঙ্গিনী প্রভৃতি পদে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গিয়াসুদ্দীন তুগলক এক নগরী নির্মাণ করেছিলেন মাণ্ডুতে, যার বাসিন্দা ছিল শুধু নারীরাই। সকল ধরনের কলা ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত করা হয়েছিল তাদের। ওই নগরীর শাসন, বিচার প্রভৃতি সকল বিভাগ পরিচালনা করতো নারীরা। ওই প্রথার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্য গোলকোণ্ডায়। হারেমে যে-পত্নীরা ছিলেন নবাবের প্রিয়, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য তিনজন করে স্বজাতির পরিচারিকা নিয়োগ করা হয়েছিল। নানা জাতির পত্নী সংগ্রহ ছিল ওই নবাবের বাতিক।

মুগলদের জেনানা মহল

মানুচচি'র বিবরণী (১৬৫৩-১৭০৫) থেকে জানা যায়, মহল (হারেম)-এর জন্য ব্যয় হতো অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ—কমপক্ষে এক কোটি রুপি। ওই তহবিল থেকে সরপ বা আঙরাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিতেন সম্রাট। পোশাকগুলো তিনি উপহার দিতেন সেনানায়ক, কর্মকর্তা ও খোজাদের। বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মানুচচি জানিয়েছেন, "ভারতবর্ষের সকল লোক সুগন্ধির ভক্ত ; ফুল, পুষ্পনির্যাস, গোলাপপানি ও সুবাসিত তেলের জন্য তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।" এ ছাড়া আছে পান ও মূল্যবান রত্ন 'ক্রমাগত ক্রয়' বাবদ ব্যয়। এই কারণে স্বর্ণকাররা অলঙ্কার তৈরির কাজে অহরহ ব্যস্ত থাকে। সবচেয়ে দামি ও সেরা রত্ন-অলঙ্কার পরেন রাজপুরুষ, বেগম ও শাহজাদিরা। এ ছাড়া গোলাপ-নির্যাসে সুবাসিত ও অতিচমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য ব্যয় করা হয় অজস্র অর্থ। খেয়ালি আবহাওয়ার কারণে তাঁরা পোশাক পরিবর্তন করেন প্রতিদিন। তারপর ছিল ভাতা ; রাজ-পরিবারে কোনও শিশু জন্ম নিলে ২০০ থেকে ৩০০ রুপি পর্যন্ত দৈনিক ভাতা দেয়া হতো। শিশুর পিতাকেও কিছু দেয়া হতো লালন-পালনের ব্যয় বাবদ। ওই শিশুর বিবাহযোগ্য বয়স না হওয়া পর্যন্ত ভাতা দেয়া হতো একই পরিমাণে, পরে তা বৃদ্ধি করা হতো অনেক গুণ বেশি। মহলে উৎসব লেগেই থাকতো। সম্রাটের প্রবীণ আত্মীয়রা করতেন এগুলোর আয়োজন। বেগম ও শাহজাদিরা তাঁদের প্রাপ্য ভাতার অর্ধেক নগদ অর্থে পেতেন রাজকোষ থেকে, বাকি অর্ধেকের জন্য বরাদ্দ ছিল জমিদারি। এতে তাদের আয় হতো নির্ধারিত ভাতার চেয়ে অনেক বেশি। আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর রমণীরা বাস করতেন আলাদা-আলাদা প্রাসাদে, আকবর-প্রদত্ত জমিদারির আয় থেকে তাঁরা চলতেন। তাঁদের মৃত্যুর পর ওইসব সম্পত্তি আবার ফিরে যায় সম্রাটের অধিকারে।

মহলের প্রশাসন

মুগল আমলে মহলে ছিল নানা জাতির ২০০ নারী। তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত ছিল বিশেষ দায়িত্ব বা কর্তব্য। সম্রাট, বেগম, শাহজাদি ও উপপত্নীদের সাহচর্য দানই ছিল তাদের প্রধান কাজ। শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল আলাদা-আলাদা কক্ষ। তারা চলতো তত্ত্বাবধায়িকার খবরদারিতে। প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়িকার অধীনে থাকতো ১০ থেকে ১২ জন পরিচারিকা।

মর্যাদা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়িকাদের মাসিক বেতন ছিল ৩০০ থেকে ৫০০ রুপি পর্যন্ত। পরিচারিকাদের মাসিক বেতন ছিল ৫০ থেকে ২০০ রুপি পর্যন্ত। এই সব তত্ত্বাবধায়িকা ছাড়াও গায়িকা ও মহিলা বাদ্যযন্ত্রীদের জন্য ছিল বিশেষ পরিদর্শিকা। তাদের বেতনও ছিল অনুরূপ, তবে শাহজাদা ও শাহজাদিদের কাছ থেকে তারা প্রচুর পারিতোষিকও পেতো। এদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার শাহজাদিদের লেখাপড়া শেখাতো।

তত্ত্বাবধায়িকাদের বিশেষ নামে ডাকা হতো ; আসল নামের বদলে ওই নামেই তারা পরিচিত হতো হারেমে। যেমন : নিয়াজ বিবি (বর্তমান মহিলা), ফাহিমাহ্ (দার্শনিক), ফলকি (সৌভাগ্যবতী), কাদির (শক্তিশালী), নোশাবাহ্ (পানীয় পরিবেশক), গুল সুলতান (রাজকীয় ফুলের নারী), দিল-জু (হৃদয়ের বিশ্রামস্থান), সিম-তন (স্বর্ণদেহী), মিহর-নিগার (দরদী দৃষ্টি), নবল বাই (নতুন রমণী), চতরাই (বিচক্ষণ), লাল বাই (চুনি), হীরা বাই, মামিক বাই (মুক্তা), মাই-ই বিকর (পূর্ণ চাঁদ)। এদের প্রত্যেকের নামে ছিল 'বানু' কথাটি।

এই তত্ত্বাবধায়িকাদের নাম দেখে মনে হয়, আগে সম্ভবত তারা হিন্দু ছিল—অপহৃত হয়ে বা অন্য কোনওভাবে মহলে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এদের প্রত্যেকের অধীনে ছিল প্রায় ১০ জন করে শিক্ষানবিশ। এরা সকলে মিলে সাহচর্য দিতো বেগম, শাহজাদা ও তাঁদের উপপত্নীদের। বেগমরা ও অন্যান্য মহিলা সময় কাটাতেন যার-যার কক্ষে। তাদের ছিল নিজস্ব সংগীত-দল। ওই সংগীত-দলের কেউই একমাত্র উৎসবের সময় ছাড়া অন্য কোথাও সংগীত পরিবেশন করতে পারতো না। পর্ব-অনুষ্ঠানে সকল সংগীত-দল মিলিত হয়ে উৎসবের গান গাইতো। এই গায়িকারা ছিল সুন্দরী ও মহিমান্বিত। কিন্তু তাদের দু'টি মারাত্মক দোষ ছিল : বাচালতা ও অতিকামুকতা।

এই তত্ত্বাবধায়িকাদেরও সরকারি নাম ছিল। তবে এদের সকলেই হিন্দু ছিল না, কেউ কেউ ছিল ইরানি। কিছু নামের উদাহরণ : জালিয়া (জাল), রস, নয়নজ্যোতি, মির্গ মালা (পুষ্প-আচ্ছাদিত), গুল রু (গোলাপ বদন), চঞ্চল, ধ্যান, জ্ঞান, হার, মুরাদ, (আকাঙ্ক্ষিতা), মতলব, আকাশ, অপ্সরা, খালদার (ফোঁটা দ্বারা রঞ্জিত), বৈকুণ্ঠ, খুশহাল (সুখী), নিহাল (প্রাচুর্য), ফারাহ (স্বাস্থ্যবতী), গুলাল (গোলাপ), কস্তুরী, কার-ই-সওয়াব (রুচি), বাসনা, উদার, কেশর (জাফরান)।

দাসী

বেগম-শাহজাদিদের দাসীরাও মর্যাদা অনুযায়ী নানা স্তরে বিভক্ত ছিল। অন্যান্য দাসীর সমান বেতন পেতো তারা। প্রত্যেক দাসীর অধীনে ছিল প্রায় ১০ জন করে নারী-কর্মচারী। দাসীদের নামকরণের ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাটরা ছিলেন খুব খুঁতখুঁতে—বিশেষ করে প্রধান দাসীর নাম দিতেন তারা বেশ ভেবেচিন্তে। হারেমের দরবারে প্রথম আসার পর তাদের চলন, বলন ও ভাবভঙ্গিতেও ওই নাম অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে

হতো। কিছু নামের উদাহরণ : চম্পা, সুভাতি (মুগ্ধকর), নকী (সৎ-স্বভাব), দৌলতী, মধুমতী, সুগন্ধরা, খুশ-নিগাহ (সৌজন্যময়ী), দিল আফরোজ (মনোরঞ্জক), জিন্দা-দিল, নিয়াজ-বু (মধুগন্ধময়), মোতি, মৃগ-নয়ন, আচানক, বাসন্তী, কামওয়াড়ি (কর্মঠ), হীরা, খুশ-আনদাম (সহিষ্ণু)।

অন্যান্য ব্যয়

শাহজাদি ও অন্য মহিলারা স্তাবকতা ও প্রশংসায় খুশি হতেন খুব। এক্ষেত্রে গায়িকাদের কোনও জুড়ি ছিল না। স্তুতি-গান গেয়ে তারা "কাঁড়ি-কাঁড়ি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা" উপহার পেতো। যে-সকল তত্ত্বাবধায়িকা এরকম স্তাবকতায় দক্ষ ছিল তারা উপহার পেতো দামি পোশাক (সরপ) ও রত্ন। তাদের বেতন-ভাতাও বৃদ্ধি করা হতো। হারেমে কোনও মাননীয়া এলে তাঁকেও এরকম উপহার দেয়া হতো ; অতি মূল্যবান সরপ ও রত্ন নিবেদন করে সম্মান জানানো হতো তাঁকে। যখন তিনি বিদায় (আদাব-আরজ) নিতেন তখন তাঁর হাত ভরে দেয়া হতো *কিচরি* ('খিচুড়ি' শব্দটির উৎপত্তি এখান থেকেই) অর্থাৎ মুঠো-মুঠো স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, ছোট ও বড় মণিমুক্তা।

রাজস্ব থেকে ব্যয় ছিল আরও অনেক ক্ষেত্রেই। শাহজাদাদের বিবাহযোগ্য বয়স (ষোল) না হওয়া পর্যন্ত তাদের শিক্ষকরা পেতেন মোটা ভাতা। উৎসবের সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হতো। প্রতিষ্ঠিত প্রথা হিসেবে জন্মদিনে উপহার দেয়া হতো দাতার সম্পদ ও পদমর্যাদা অনুযায়ী।

প্রহরা

হারেম-রমণীদের নিরাপত্তার জন্য সতর্ক প্রহরায় নিয়োজিত থাকতো নারী-রক্ষী ও খোজা-প্রহরীরা। হারেমের প্রতিটি বিভাগে সম্রাট আকবর কয়েকজন সতী নারীকে দারোগা ও তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। হারেম পাহারা দিতো নম্র ও কর্মঠ নারীরা। যারা সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত তাদের নিয়োগ করা হতো সম্রাটের কক্ষের চারপাশে। প্রাচীরের বাইরে পাহারা দিতো খোজারা। তাদের থেকে অল্প দূরে-দূরে পাহারা দিতো বিশ্বস্ত রাজপুতরা। আর তাদেরও পরে ছিল ফটকের প্রহরীরা। চারদিকে এত পাহারাদার থাকার পরও বিশেষ পাহারায় নিয়োজিত থাকতো অমাত্য, অহড়ি ও পদ অনুযায়ী অন্যান্য বাহিনীর প্রহরীরা। এ ছাড়া ছিল সশস্ত্র নারী-বাহিনী—যাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কিংবা পরবর্তীকালের রণজিৎ সিং-এর সময়কার রণরঙ্গিনীদের। সম্রাট আকবরের উদ্ভাবিত বলে কথিত গুলাবর অর্থাৎ মহাবেষ্টনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক আবুল ফজল জানিয়েছেন, এর সঙ্গেই ছিল ৬০ বর্গগজ কার্পেটের এক সরপরদাহ—যার ভেতরে ছিল উর্দুবেগি অর্থাৎ সশস্ত্র নারী-সৈনিকদের কয়েকটি তাঁবু।

খোজা

সেই আদিকাল থেকেই খোজারা হয়ে আছে হারেমের আনুষঙ্গিক। বিজয়নগরের দরবারে, খোজা-রক্ষীরা ছাড়া অন্য কারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না অন্তঃপুরে।

কতিপয় উচ্চপদস্থ প্রবীণ কর্মকর্তা ছাড়া কেউ রাজ-পরিবারের মহিলাদের দেখতে পেতেন না, এই দেখতে পাওয়াটাও ছিল রাজার বিশেষ অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। মহিলারা কেউ কখনও বাইরে যেতে চাইলে তাদের বহন করা হতো 'বন্ধ ও আটকানো' (*সেলাদোস* অর্থাৎ সিলবন্ধ) ডুলিতে, তখন তাদের পাহারা দিয়ে চলতো তিন বা চার শ' খোজা-রক্ষী। এই খোজারই রাজার বার্তা পৌঁছে দিতো রানীদের কাছে। মুসলিম হারেমে খোজাদের দেখা যেতো অনেক বেশি সংখ্যায়।

খোজারা ছিল সকলের অপ্রিয়। কারণ তারা 'অতিশয় ধনলোভী', মূল্যবান রত্নসংগ্রহ ও উৎকোচ গ্রহণ ছিল তাদের নেশা, কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে অর্থ ব্যয় করতে রাজি হতো না সহজে। তা হলেও জাঁকালো পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে খুব আগ্রহী ছিল তারা ; যেন তারাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব—এমন ছিল তাদের ভাবখানা। রাজকন্যাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল খোজারা। তাঁরা যথেষ্ট সদয় ছিলেন তাদের প্রতি। অনুমান করা হয়, মাঝে-মধ্যে তাদের সঙ্গে যৌনাচারেও মিলিত হতেন তারা। এ ছাড়া হারেমে গোপনে প্রেমিকদের নিয়ে আসার ব্যাপারটাও খোজাদের সহায়তা ছাড়া সম্ভব ছিল না। স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক নারী নির্ভর করতো খোজাদের ওপর। মহিলাদের প্রতি তারা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, কিন্তু শত্রুভাবাপন্ন ছিল পুরুষদের প্রতি; তারা কথাবার্তায় ছিল নোংরা, অশ্লীল কেচ্ছা-কাহিনী ফিরতো তাদের মুখে-মুখে। মুসলিম খোজারা ধর্মকর্ম পালন করতো নিষ্ঠার সঙ্গে, পাশাপাশি তারা সুরাপানেও ছিল অভ্যস্ত। সকলের পিছু নেয়া ছিল তাদের কাজ ; আড়ি পেতে তারা রাজা, রাজপুত্র, রানী ও রাজকন্যাদের কথা শুনতো।

খোজাদের দৈহিক পরিবর্তন

যুবাবয়সে খোজাদের দেহে বিশেষ পরিবর্তন ঘটতো। ফ্রানকোসিস পিয়ার্দ ভারত ভ্রমণকালে (১৬০১-'১১) লক্ষ্য করেছেন বঙ্গদেশ থেকে বেশির ভাগ দাস সংগ্রহ করার ব্যাপারটি। তিনি লিখেছেন, বণিকেরা শুধু অণ্ডকোষ নয় পুরো পুরুষাঙ্গ কেটে তাদের নপুসংক বানাতো। পিয়ার্দ এ-ধরনের অনেক খোজা দেখেছেন যাদের দেহে প্রস্রাবের জন্য সামান্য ফুটো রয়েছে মাত্র। তাদের ওপর মেয়েদের দেখাশোনা ও ঘর-বাড়ির চাবি রাখার দায়িত্ব ন্যস্ত হতো বলে সেকালে খোজা বানানোর এমন প্রথা চালু হয়েছিল। স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাসী পুরুষরা পুরোপুরি বিশ্বাসী হতো তাদের প্রতি। এই বিবরণের সঙ্গে অন্য একজন পর্যটক বারবোসা-র বৃত্তান্ত (১৫০৪-'১৪) মিলে যায়। তিনি জানিয়েছেন, মুর জাতীয় বণিকরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শান্ত প্রকৃতির বালকদের কিনে আনতো বিজয়নগরে, তারপর পুরষাঙ্গ কেটে তাদের নপুংসক বানাতো। এই বালকদের দরিদ্র পিতামাতা অথবা ছেলে-ধরাদের কাছ থেকে কিনে আনা হতো। পুরষাঙ্গ কেটে ফেলায় কিছু কিছু বালকের মৃত্যুও ঘটতো, তবে যারা বেঁচে যেতো তারা সবল সুঠামদেহী হয়েই বেড়ে উঠতো। পরে তাদের পণ্য হিসেবে জনপ্রতি

২০ বা ৩০ ডুকাট মূল্যে বিক্রি করা হতো পারসিদের কাছে—তারা তাদের নিয়োগ করতো স্ত্রীদের এবং ঘরবাড়ির রক্ষী হিসেবে। এ-ধরনের নিয়োগ মহানবী কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, কারণ এ ব্যবস্থায় মানুষকে ব্যবহার করা হয় পণ্যরূপে।

হিজড়া

এই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। যাকে হিজড়া বানানো হতো, তাকে প্রথমে আফিম খাইয়ে আচ্ছন্ন করা হতো, তারপর তার পুরুষাঙ্গটি কেটে ফেলা হতো পুরোপুরি। ক্ষতস্থানে তখন ফুটন্ত তেল ঢেলে গরম তেলে ভেজা একটি পট্টি লাগানো হতো। এভাবে নবজন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শয্যাশায়ী থাকতে হতো ৪০ দিন। মাতৃদেবী 'বহুচরামাতা'র উপাসনা করতো এরা।

খোজা-প্রহরী ও রক্ষী

মুগল হারেমগুলোতে খোজারা এক ধরনের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীন ছিল। নাজিরের অধীনেও কাজ করতো তারা; জেনানা-মহলে নির্দেশপত্র কিংবা বার্তা পৌঁছে দেয়া ছিল তাদের প্রধান কাজ। অন্য খোজারা মোতায়েন থাকতো দরজায় দরজায়—মহলে কে এলো, কে গেল তা দেখার জন্য। মহলে পাঠানো সকল মালপত্র তারা তন্ন-তন্ন করে তল্লাশি করতো—যাতে ভাং, মদ, আফিম, জায়ফল প্রভৃতি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য চালান না হতে পারে। এগুলোর অতি-অনুরাগী ছিল হারেম-রমণীরা। এ ছাড়া মেয়েরা অপব্যবহার করতে পারে এই আশঙ্কায় মূলা, শসা ও বেগুন—এ ধরনের কোনও সব্জি তারা ভেতরে নিয়ে যেতে দিতো না।

সকল বহিরাগতকে চোখ বেঁধে ঢুকতে হতো হারেমে। এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটতে দিতো না খোজারা। চিকিৎসক হিসেবে মানুচচি যখন প্রথম প্রাসাদে যান তখন চোখ বেঁধে দেয়া হয়েছিল তাঁর। খোজা-প্রহরীদের তাড়া সত্ত্বেও তিনি চলছিলেন অত্যন্ত ধীরে-ধীরে। এটা দেখে তার পৃষ্ঠপোষক শাহজাদা শাহ আলম তার চোখের বাঁধন খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর থেকে চোখ-খোলা অবস্থাতেই মহলে আসা-যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল তাঁকে। মানুচচি যে লিখেছেন 'খ্রিষ্টানদের মন মুসলমানদের মতো নোংরা নয়', তা নিঃসন্দেহে একটি বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য। খোজা-রক্ষীরা অপরিচিত মহিলাদের ওপরও কড়া তল্লাশি চালাতো—কারণ মহিলার ছদ্মবেশে পুরুষের ঢুকে পড়ার ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন থাকতো সবসময়েই। মহলে কাজ-কর্ম করার জন্য সুতার বা মিস্ত্রিদের প্রায়ই যেতে হতো। তাদের ওপর কড়া নজর রাখতো খোজারা। মহলে ঢোকার আগে তাদের নাম ও সনাক্তচিহ্ন লেখা চিরকুট পাঠিয়ে দেয়া হতো ভেতরের প্রহরীদের কাছে। প্রতি ফটকে সেই চিরকুটের বিবরণ মিলিয়ে দেখা হতো। বেরিয়ে আসার সময়ও ছিল একই ব্যবস্থা। তাই কারও ভেতরে থেকে যাওয়া ছিল অসম্ভব।

নারী প্রহরী

কাশ্মিরি নারীদের সাধারণত হারেমে নিয়োগ করা হতো পাহারার কাজে। প্রতিটি মহিলার কক্ষের দরজায় তারা পাহারা দিতো, এ-ছাড়া তাদের ফাইফরমাশও খাটতো। এরা অন্য মেয়েদের মতো পরদা করে চলতো না।

মহলের প্রধান দরজাগুলো বন্ধ করা হতো সূর্যাস্তের সময়। সদর দরজায় তখন পাহারা দিতো 'বিশ্বস্ত রক্ষীরা'। কপাটে সিল মারা হতো, কারণ সাত্রীদের সামনে ওই সিল ভাঙা হতো। সারারাত মশাল জ্বলতো মহলে। ঘড়ি ছিল প্রতিটি কক্ষে। কোন সময়ে কি ঘটেছে মহিলার কক্ষে তা লিখে প্রহরীদের জমা দিতে হতো নাজিরের কাছে।

মাতৃকা গুপ্তচর

মাতৃকাসুলভ প্রবীণাদের গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগের প্রথা চালু ছিল পূর্বাব্দ ৪র্থ শতক থেকেই। সেকালে তপস্বিনী বা পরিব্রাজিকার জীবনযাপন করতো দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবারা; এদের অনেকে ছিল চতুর স্বভাবের এবং জীবিকা অর্জনে আগ্রহী ; এরা 'মর্যাদা পেতো রাজার হারেমে'। রাজার প্রধান মন্ত্রী (মহামাত্রকুলানী)-দের বাসগৃহে এরা যাতায়াত করতো প্রায়ই। মুণ্ডিতমস্তক নারীরা (মুণ্ডা) তথা শূদ্র রমণীরাও এ-ধরনের গুপ্তচর-বৃত্তিতে নিয়োজিত হতো। হারেমের কর্মকর্তা সহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন সকল রাজপুরুষের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য সারাদেশে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করা হতো সদ্বংশজাত, অনুগত, বিশ্বস্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রমণীদের ; এরা ছদ্মবেশ ধারণে নিপুণ ও নানা কলায় দক্ষ হতো, কয়েকটি ভাষায় কথা বলতেও পারতো। বৈদ্য নারীরা সংগৃহীত তথ্য পৌঁছে দিতো গুপ্তচর-সংস্থা (সংস্থানমন্তবাসীনাঃ)-য়; তথ্যগুলো যাচাইয়ের জন্য সংস্থার কর্মকর্তারা সাঙ্কেতিক লিপি (সংজ্ঞালিপিভিঃ)-র মাধ্যমে নিয়োগ করতো নিজস্ব গুপ্তচর। সংস্থার কর্মচারী ও ভ্রাম্যমাণ গুপ্তচরেরা ছিল একে অন্যের অপরিচিত। উভয়পক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য একই রকম হলে তা বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হতো। এ-সকল গুপ্তচর ছাড়াও খোজা ও সংগীত-নৃত্যাদি-কলাবিদ্যায় দক্ষ রমণীদের নিয়োগ করা হতো বরাবরের মতো চলে আসা আঠারোটি সরকারি বিভাগ (অষ্টাদশ তীর্থ)-এর অভ্যন্তরে। সকল গুপ্তচরের বেতন দেয়া হতো সাধারণ রাজস্ব থেকে।

মুগল হারেমের মাতৃকা গুপ্তচর

রাশভারি প্রবীণাদের গুপ্তচর-বৃত্তিতে নিয়োগ ছিল, বলতে গেলে, এক মুগলপ্রথা। খোজাদের মাধ্যমে এরা খবর নিতো 'সাম্রাজ্যের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তরুণীদের' সম্পর্কে। তারপর নানা অঙ্গীকার ও ছলনা করে তাদের নিয়ে আসতো সম্রাট বা শাহজাদাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রাসাদে। সেখানে তাদের বন্দিজীবন কাটতো অন্যান্য রক্ষিতা ও উপপত্নীর

সঙ্গে। পরে যদি সম্রাট বা শাহজাদা আগ্রহ হারিয়ে ফেলতেন তা হলে তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হতো কিছু উপহার-উপঢৌকন দিয়ে। শাহজাহান ও দারা শুকো'র জীবনে এমন ঘটনা ছিল অনেক।

হারেমের নারী-কর্মকর্তা

মুগল সম্রাটগণ মহলের ভেতরে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করতেন নারীদের। তাঁদের অনেকে বাইরের কর্মকর্তাদের মতো একই পদে আসীন ছিলেন। সম্রাট যখন দরবারে না গিয়ে বিশ্রাম-কক্ষে অবস্থান করতেন তখন এই নারী-কর্মকর্তাদের মাধ্যমেই নির্দেশাবলি পাঠাতেন বাইরের কর্মকর্তাদের কাছে। এঁদের নিয়োগ করা হতো বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ; 'বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা'র জন্য এঁরা সুখ্যাত ছিলেন, পাশাপাশি সাম্রাজ্যের কোথায় কি ঘটছে, সে-খবরও রাখতেন। সম্রাট যখন প্রাসাদ-অভ্যন্তরে থাকতেন তখন বাইরের কর্মকর্তাদের পাঠানো বার্তার জবাব, সম্রাটের নির্দেশে, এঁরাই দিতেন। বিজয়নগরের হারেমেও চালু ছিল একই রকম ব্যবস্থা। ওই সিলবন্ধ বার্তা বহন করে নিয়ে যেতো খোজারা।

সাম্রাজ্যের প্রকাশ্য (ওয়াকিয়াহ-নবিশ) ও গোপন-বার্তা লেখক (খুফিয়াহ-নবিশ)-গণ সপ্তাহে একদিন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির বিবরণ লিখে পাঠাতেন বার্তাপত্র (ওয়াকিয়াহ্)-এর আকারে। রাত ন'টার দিকে মহলে সম্রাটের সম্মুখে ওই বার্তাপত্রগুলি 'সাধারণত' পড়তেন নারী-কর্মকর্তাগণ। এ ছাড়া নারী-গুপ্তচরেরাও সপ্তাহে একদিন অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে লিখিত বিবরণ পেশ করতো। তবে শাহজাদাদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়াই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

হারেমের নারী-সৈনিক

এই প্রথাটিও প্রচলিত ছিল প্রাচীনকাল থেকে। কৌটিল্য পরামর্শ দিয়েছিলেন : ঘুম থেকে জাগার পর সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে অবশ্যই অভ্যর্থনা জানাবে 'তীর-ধনুকে সজ্জিতা' নারী-বাহিনী। রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধানের অন্যতম উপায় হিসেবে এই প্রথা অব্যাহত ছিল শ' শ' বছর ধরে। কাশ্মিরের মহারাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৭১৩-'৫০) ও তাঁর উত্তরাধিকারী জয়াপীড় (৭৬২-'৬৩)-এর আমলে নারী-সৈনিকদের যথেষ্ট দাপট ছিল। চীনা পর্যটক চৌ রা কুয়া (৯৯৮-১০২৩) এদের কার্যক্রম লক্ষ্য করেছেন কেরল রাজ্যে। ১৬শ শতকে বিজয়নগরের ১২,০০০ রমণীর মধ্যে অনেকে ছিল ঢাল-তলোয়ার ব্যবহারে নিপুণ, ছড়ি ও চাবুক হাতে কুচকাওয়াজে দক্ষ, যন্ত্রবাদক, কুস্তিগির, বিচারক, কৌঁসুলি ও হারেম-রক্ষী—যারা রাজার বার্তা গ্রহণ করতো খোজাদের মাধ্যমে। পর্যটক পায়েস বিজয়নগর-প্রাসাদ পরিভ্রমণকালে 'তীর ও ধনুকে সজ্জিতা রণরঙ্গিনী রমণীদের' কাঠখোদাই মূর্তি দেখেছেন লম্বা বারান্দার নানা স্থানে স্থাপিত। এ-ধরনের মূর্তি এখনও দেখা যাবে হমপি-তে।

মুগল আমলে নারী-সৈনিক

মানুচচি লিখেছেন, নিদ্রাকালে মুগল সম্রাটের প্রহরায় নিয়োজিত থাকতো 'ক্রীতদাসীরা—যারা ছিল অত্যন্ত সাহসী এবং তীর ও অন্যান্য অস্ত্রচালনায় বিশেষ পারদর্শী'। মুগল শাসনামলে নারী-সৈনিক নিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদেশ থেকে মর্দানি বা জাঁহাবাজ ধরনের মেয়েদের আনা হতো দরবারে বিক্রয়ের জন্য। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে অনেক লোক-লশ্‌কর নিয়ে বলখ-এর দূত এসেছিলেন দরবারে। তাঁর সঙ্গে বিক্রয়ের জন্য ছিল বেশ কিছু তাতার ও উজবেক রমণী। এই ক্রীতদাসীদের পরে নিয়োগ করা হয়েছিল হারেমে ; এদের কেউ-কেউ পরে হয়েছিল পালকি-বাহিকা, কেউ-কেউ হয়েছিল নৈশরক্ষী। সম্রাট বা শাহজাদাগণ যখন বেগমদের নিয়ে ঘুমাতেন তখন দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিতো এরা। এ-কাজে এদের নিয়োগ করা হয়েছিল বর্শা, তীর ও তলোয়ার চালনায় দক্ষতার কারণে। এদের একজনকে ডাকা হতো 'যক্ষী' নামে—তুর্কি ভাষায় যার অর্থ ভাল। তীরনিক্ষেপে সে ছিল প্রায় অব্যর্থ। একে কিনেছিলেন মির বকশি আসালত খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান হোসেন, পরে তাকে তিনি উপহার হিসেবে পাঠান সম্রাটের কাছে। নৈশরক্ষী হিসেবে নিয়োজিত অসংখ্য কাশগড়, কুমাক, তাতার, পাঠানি ও আবিসিনিয়ান রমণীর সঙ্গে তাকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন আওরঙ্গজেব। কয়েক মাস পর প্রধানা রক্ষী সম্রাটকে জানান, যক্ষী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। শুনে আওরঙ্গজেব মন্তব্য করেন : ছেলে হলে নিজের ছেলে ও মেয়ে হলে নিজের মেয়ের মতো করে তাকে লালন-পালন করবেন। পরে ছেলে হলে আওরঙ্গজেব তাকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন, তাকে 'আলমোতশ বাহাদুর' উপাধিতেও ভূষিত করেন।

পরবর্তী কালের নারী-সৈনিক

নারী-সৈনিক প্রথাটি চালু ছিল ১৯শ শতক পর্যন্ত। শিখ অধিপতি রণজিৎ সিং নিজের অঙ্গরক্ষীর জন্য এক নারী-বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই বাহিনীতে ছিল পাঞ্জাব, কাশ্মির ও পারস্যের সুন্দরী সব যুবতী। ১৮৩৮ অব্দের মে মাসে এই বাহিনী গঠন সম্পূর্ণ হয়। নারী-সৈনিকরা পরতো জমকালো পোশাক, আর চড়তো ঘোড়ায়। তারা বেতন পেতো যৎকিঞ্চিৎ, কিন্তু তাদের কেউ-কেউ রণজিৎ সিংকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল কয়েকটি করে গ্রাম। গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড-এর সমর-সচিব অসবর্ন-এর কাছে তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন, ওই মেয়েরা 'তাঁর বাকি সেনাবাহিনীর চেয়ে' বেশি সমস্যায় ফেলে রাখে তাঁকে।

প্রায় একই সময়ে অযোধ্যার মুহম্মদ শাহ নামে খ্যাত সুলতান নাসির-উদ-দীন (১৮৩৭-৪২) পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এক নারী-সৈন্যবাহিনীর। তাঁরা মাথার ওপরে চূড়া করে চুল বাঁধতো, তবে সাধারণ সৈনিকদের মতোই সাজগোজ করতো; তাদের হাতে থাকতো গাদা বন্দুক ও বেয়নেট, পরনের জ্যাকেট ও সাদা প্যান্টের সঙ্গে বাঁধা থাকতো গুলি বেল্ট ও কার্টিজের বাক্স। হারেমের সান্ত্রি হিসাবে দায়িত্ব পালন করাই ছিল তাদের

আসল কাজ, তা হলেও তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো সাধারণ সৈনিকদের মতো করে; সুলতানের সৈন্যবাহিনীর একজন পুরুষ-কর্মকর্তা তাদের শেখাতেন কুচকাওয়াজ, বন্দুক-চালনা ও ছাউনি-জীবনের অন্যান্য কাজ। তাদের বাহিনীতে ছিল নিজস্ব করপোরাল, সার্জেন্ট, কমিশনড্ ও নন-কমিশনড্ অফিসার। অনেকেই ছিল বিবাহিতা, প্রয়োজন অনুসারে তারা ছুটিও উপভোগ করতো। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে তারা অংশও নিয়েছিল। সুলতান নাসির-উদ-দীনকে শেষ পর্যন্ত বিষ প্রয়োগ করেছিল এক স্থূলকায়া বাহিকা—যে ছিল দরবার ও হারেমের পাহারায় নিযুক্ত অন্য এক নারী-রক্ষীবাহিনীর সদস্যা।

মুগল আমলে নারীদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শুধু নারী-সৈনিকরাই জানতো না। ১৬০০ সালে জাহাঙ্গির যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন ওই বিদ্রোহীদের দমাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল সম্রাট আকবর-এর। তাঁর সেনা কর্মকর্তারা একবার যখন এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছায় তখন গ্রামবাসীরা লুকিয়ে পড়ে। তাদের স্ত্রীরা 'বল্লম ও ধনুক হাতে দাঁড়ায় স্বামীদের পেছনে। স্বামীর গাদা বন্দুক ছোঁড়া হয়ে গেলে স্ত্রী তুলে দিতো তার হাতে বল্লম, তারপর গাদা বন্দুকে ঠাসতো বারুদ। ওইভাবে তারা আত্মরক্ষা করেছিল। পরে যখন মরিয়া যুদ্ধ শুরু হয় তখন পুরুষরা স্ত্রী ও কন্যাদের শিরশ্ছেদ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। এমন বেপরোয়া সাহস দেখিয়ে কয়েকটি যুদ্ধে তারা জয়ীও হয়েছিল।'

হারেমের অন্যান্য কর্মচারী

অন্য নানারকম পেশায় নিয়োজিত ছিল রাজপ্রাসাদের নারীরা। কেউ ছিল সুগন্ধি-প্রস্তুতকারী, কেউ ছিল পালকি বা দীপ বা মশাল বাহিকা।

পালঙ্ক ও পালকি বাহিকা : রাজপরিবারের মহিলাদের স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হতো পালঙ্ক অথবা পালকিতে করে। নারী ও পুরুষ উভয়েই বহন করতো এগুলো। হিন্দু ও মুসলিম উভয় হারেমেই এ প্রথা চালু ছিল। ৭ম শতকে সিন্ধুরাজ্যে পালঙ্ক ছিল মহিলাদের বাহন। খুরাজ-অধিপতির বোন জানকী-কে মোহাচ্ছন্ন করেছিল সিন্ধুর রাজা দাহির ('দধি রাজা')-এর পুত্র জয়সিয়া। একদিন জানকী 'এক পালঙ্ক প্রস্তুত করে তাতে আসীন হয় ; তারপর দাসীদের তা বহন করে নিয়ে যেতে বলে ; এইভাবে (নিজের বাসগৃহ থেকে) সে যায় জয়সিয়া-র বাসগৃহে। পালঙ্ক থেকে নেমে সে প্রবেশ করে ভেতরে।' এটা ছিল নিশ্চয়ই ঐতিহ্যিক যাতায়াত-ব্যবস্থা। কাশ্মিরেও পালঙ্কের প্রচলন ছিল। রানী দিদ্দা খোঁড়া ছিলেন বলে কখনও হাঁটতে পারতেন না। বাহকেরা তাঁকে বহন করতো পিঠে। ১০৬৩-'৮৯ অব্দের এক বিবরণীতে দণ্ডক নামের এক পালঙ্ক-বাহকের উল্লেখ পাওয়া যায়। পালঙ্কে করে মৃতদেহ বহনেরও প্রথা ছিল সেকালে। রাজা অনন্ত আত্মহত্যা করেছিলেন ১০৬৩ অব্দে। শেষকৃত্যের পর তাঁর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল পালঙ্কের ওপর। ১২শ শতকেও পালঙ্ক-বাহক নিয়োগের উল্লেখ

পাওয়া যায়। রাজা জয়সিংহ যখন কাশ্মির শাসন করতেন (১১২৮-'৪৯), তখন বিদ্রোহী মল্লার্জুন আত্মসমর্পণ করে। এক পালঙ্কে চড়িয়ে তাকে নিয়ে যান উদয়।

পালকি বাহিকা : বিজয়নগরের সম্রাজ্ঞীরা যখন হারেম বা অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতেন তখন তাঁদের 'বহন করা হতো আবৃত ও বদ্ধ পালঙ্কে'। প্রত্যেক সম্রাজ্ঞীই অবশ্য নিজেদের 'দুই দণ্ডযুক্ত পালকিতে চড়ে' বের হতেন। প্রধানা সম্রাজ্ঞীর পালকি ছিল রক্তবর্ণ বস্ত্রে আবৃত—যা বিশদরূপে মুক্তাদানায় খচিত। আর ওই পালকির দণ্ড দু'টি ছিল স্বর্ণ-রঞ্জিত। অন্য রানীদের পালকি ছিল রৌপ্য-খচিত। তবে সম্রাট যদি ভ্রমণকালে কোনও পুত্র বা কন্যাকে সঙ্গে নিতেন তা হলে থাকতো 'আরেকটি স্বর্ণ-খচিত গজদন্তের পালঙ্ক'। রানীদের পালকিগুলো বহন করতো নারীরা। রাজা অচ্যুত দেব রায় (১৫৩০-'৪২)-এর প্রাসাদ-অভ্যন্তরস্থ হারেমে ছিল হাজারেরও বেশি রমণী। প্রত্যক্ষদর্শী নুনিজ-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাদের অনেকে ছিল নর্তকী, অনেকে ছিল সম্রাজ্ঞীর পালকি-বাহিকা। প্রাসাদ-অভ্যন্তরে তারা সম্রাটকেও বহন করতো। রাজপ্রাসাদটি ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে, এক ভবন থেকে অন্য ভবনের দূরত্ব ছিল অনেকখানি।

মুসলিম শাসনকালে পালঙ্ক বাহিকা : মুসলিম শাসকরাও পালঙ্ক বাহিকা নিয়োগ করতেন। ১২৪৬ অব্দের ১০ই জুন শাহজাদা মুয়াজ্জম নাসির-উদ-দুনিয়া-র জননী মালিকা-ই-জাহান তাঁকে নিয়ে দিল্লি ছেড়ে রওনা হন বাহরাইচ-এর উদ্দেশে। গদিচ্যুত ভাইয়ের সিংহাসনে আরোহণের আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি মায়ের সঙ্গে যান পালঙ্কে চড়ে। তাঁর সামনে ও পেছনে ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। কিন্তু রাতের বেলায় তাঁর মুখ পর্দায় ঢেকে রাখা হয়। পরে তাঁকে এক ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় দিল্লির দিকে।

পালকি বাহক : সম্রাট শাহজাহানের সময়ের (১৬২৮-৬৬) পর্যটক তাভেরনিয়ের পালকি-বাহকদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, রাজপরিবারের মহিলারা সাধারণত সকাল ন'টার দিকে বাইরে বেরোতেন ; তাঁদের সঙ্গে থাকতো ৩-৪ জন খোজা ও ১০-১২ জন দাসী। শাহজাদিরা যেতেন কারুকাজ-করা বস্ত্রে আবৃত পালকিতে বসে। প্রতিটি পালকির পেছনে যেতো একটি করে শকট—যাতে মাত্র একজনের স্থান সঙ্কুলান হতো। ওই শকট টেনে নিয়ে যেতো দু'জন চালক। শকটের চাকাগুলোর ব্যাস এক ফুটের বেশি ছিল না। উদ্দিষ্ট ভবনের সামনে উপস্থিত হওয়ার পর খোজারা পালকি-বাহকদের নিয়ে যেতো ফটক-সংলগ্ন ঘরে। শাহজাদি ততক্ষণে পালকি থেকে নেমে শকটে গিয়ে বসতেন। ওই ভবনের দাসীরা এসে তখন শকট টেনে নিয়ে যেতেন অন্তঃপুরে।

পালকি বাহক ও খোজা : মুগল আমলে পালকি-বাহক ও খোজারা ছিল একে অন্যের পরিপূরক। সম্রাট আকবরের শাসনকালে শাহজাদিরা বেড়াতে যেতেন জমকালো

পালকিতে চড়ে। দামি কাপড় অথবা সোনার জালে আচ্ছাদিত হতো ওই পালকিগুলো। মূল্যবান রত্ন-পাথর অথবা আয়নাও বসানো থাকতো তাতে। খোজারা চলতো পালকি ঘিরে। মাছি তাড়াবার জন্য তাদের হাতে থাকতো ময়ূরপুচ্ছের পাখা—যার দণ্ড হতো স্বর্ণ-রঞ্জিত ও রত্ন-খচিত। পালকির সামনে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত দণ্ড উঁচিয়ে ভৃত্যরা যেতো 'হট যাও' 'হট যাও' করতে-করতে। এ ছাড়া পালকির পাশে-পাশে নানা ধরনের সুগন্ধি বয়ে নিয়ে যেতো তারা।

মাহুত : আবৃত হাওদায় হারেমের মহিলাদের বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাতি ব্যবহার করা হতো। আওরঙ্গজেবের কাশ্মির-ভ্রমণকালে তাঁর প্রিয় ভগ্নি রোশন আরা হয়েছিলেন তাঁর সহগামী। তিনি চড়েছিলেন 'পীতাম্বর নামের এক বিশাল হাতির পিঠে, যার হাওদাটি ছিল একটি গম্বুজ-আচ্ছাদিত সিংহাসন—অত্যন্ত জমকালো, স্বর্ণ-রঞ্জিত এবং কারুকার্য-খচিত'। ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে অনুসরণ করেছে তাঁর ১৫০ জন দাসী, নানা রঙের বোরখায় যারা ছিল আপাদমস্তক আবৃত, আর তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল একটি করে বেতের ছড়ি। রোশন আরা'র হাতির সামনে ছিল পতাকাবাহী চারটি হাতি আর বেশ কয়েকজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির খোজা—পথের দু'পাশের মানুষজনকে কিল-ঘুষি ও ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়া ছিল তাদের কাজ। সবার পেছনে ছিল সোনার জালে আচ্ছাদিত কয়েকটি পালকি—যার আরোহী ছিল তাঁর প্রিয়পাত্রীরা। রোশন আরার লশকরের পর ছিল আওরঙ্গজেবের তিন বেগমের লশকর—যাঁর-যাঁর নিজস্ব পালকি ঘিরে।

প্রদীপ ও মোমবাতি বাহক : তেলের প্রদীপ, মোমবাতি, মশাল এবং এই ধরনের আলোক-ব্যবস্থার জন্য মুগল হারেম ও দরবারে নিয়োজিত ছিল বিশেষ বাহক-বাহিকা। হিন্দু শাসকরাও নিয়েছিলেন একই ব্যবস্থা। কাশ্মিরের রাজা উচ্ছিল (১১০১-'১১)-এর রাজত্বকালে প্রাসাদ-আক্রমণকারী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে রাজানুগত কর্মচারীদের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। রাজ্যবত্ত নামের এক দীপবাহক নিরস্ত্র অবস্থায় লড়াই করেছিল পিতলের দীপদণ্ড দিয়ে। ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে ঘায়েল করেছিল তরবারি চালিয়ে। দিনের বেলায়ও অন্ধকার হয়ে থাকতো বলে রাজা সুস্‌সল (১১১২-'২০)-এর নির্দেশে অন্তঃপুরে বাতি জ্বালিয়ে রাখতো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা।

অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের সময় পুরো ভবন আলোক-উজ্জ্বল রাখার দায়িত্ব পালন করতো ভৃত্যরা। ৯৩৬-'৩৭ সালে চক্রবর্মণ যখন তৃতীয় বারের মতো কাশ্মিরের রাজা হলেন, তখন বিদেশাগত এক ডোম্ব সংগীতবিশারদ আসর বসাতে আসেন সভাগৃহে। তাঁর সঙ্গে একদল নর্তকীও ছিল। রাজা সম্মতি জানানোর পর বহির্ভাগের অভ্যর্থনাকক্ষে আসর বসে এবং গোটা গৃহ 'প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে'।

হিন্দু হারেমে মোমবাতি বাহক : রাতের বেলায় হিন্দু রাজাদের সভাগৃহে ও হারেমে মোমবাতি জ্বালানো হতো। প্রাসাদ-কর্মকর্তারা পদমর্যাদা অনুসারে চার থেকে বারোটি

পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালাতে পারতেন। সর্বোচ্চ পদে আসীন কর্মকর্তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল বারোটি মোমবাতি। তবে বিজয়নগরের সম্রাট ১০০ থেকে ১৫০টি পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালাতেন। পর্যটক নুনিজ লিখেছেন, 'রাজ্যে প্রচুর মোম ছিল কিন্তু লোকজন এর ব্যবহার জানতো না।' কথাটি সত্য নয়, কারণ মুগল হারেমে মোমবাতির প্রচলন ছিল অনেক আগে থেকেই।

মশাল বাহক : হিন্দু রাজাদের প্রাসাদে মশালের ব্যবহারও ছিল যথেষ্ট। বিজয়নগরের মহানবমী উৎসবের সময় অসংখ্য মশাল ধরানো হতো সূর্য অস্ত যেতেই; বিশাল প্রাঙ্গণ জুড়ে কাপড়ে নির্মিত বড়-বড় মশাল এমনভাবে সাজানো হতো যে গোটা এলাকা হয়ে উঠতো দিনের মতো উজ্জ্বল দেয়ালের ওপরে সারি সারি মশাল জ্বলতো ; আর যেখানে রাজা আসন গ্রহণ করতেন সেখানে থাকতো অজস্র মশাল।

মুসলিম শাসনকালে মোমবাতি : খিলজিদের শাসনকালেও দরবারে ও হারেমে মোমবাতির ব্যবহার ছিল। কুতবুদ্দিন খিলজিকে হত্যার পর সেই দুর্ভাগ্যজনক রাতে দুর্বৃত্ত পরোয়ারিরা গোটা প্রাসাদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, তারপর অসংখ্য প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালিয়ে সভা-অনুষ্ঠান করে।

মুগল হারেমেও রাজ-রমণীদের অন্যতম বিনোদন ছিল বড়-বড় মোমবাতি জ্বালানো। এজন্য তারা দেড় হাজার রুপিরও বেশি খরচ করতেন। মোম ও তেলের প্রদীপের পাশে সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতো বাহক-বাহিকারা। রাজমহলের অভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলতো সারারাত। মত্ত-অবস্থায় বাবর একবার তাঁর মাতাল সঙ্গীদের নিয়ে দুরন্ত অশ্বচালনায় মেতে উঠেছিলেন দাউ-দাউ করে জ্বলা প্রদীপের আলোয়। রাতের বেলায় আকবর চৌগান (পোলো) খেলতেন অজস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে।

হিন্দু রাজকন্যারাও পিছিয়ে ছিলেন না প্রদীপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে রাতে আয়োজিত নাচের আসরে কত শত প্রদীপ যে জ্বালানো হতো! মাণ্ডু'র রাজপুত-সরদার সিলহড়ি পুরবিয়া ছিলেন নর্তকীদের বিশেষ গুণগ্রাহী। নৃত্য-সংগীতশিল্পীদের চারটি দলকে ভরণপোষণ করতেন তিনি। তাঁর রাতের আসরে ডাক পড়তো এই দলগুলো থেকে বাছাই-করা ক'জন নতর্কীর। তারা নৃত্য পরিবেশন করতো প্রদীপের আলোয়। ওই প্রদীপগুলো ধরে থাকতো চল্লিশজন বাহক-বাহিকা। সোনার ব্রোকেড অথবা স্বর্ণখচিত পোশাক পরা ওই নর্তকীদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল দু'জন করে দাস ; একজন ধরে থাকতো পানের বাটা, অন্যজন সুগন্ধি তেল ঢালতো জ্বলন্ত প্রদীপে। ওই সুগন্ধি তেল ছিল সাধারণ তেলের সঙ্গে গোলাপ-তেলের মিশ্রণ। সাধারণ তেল দুর্গন্ধ ছড়ায় বলে তার সঙ্গে গোলাপ-তেল মেশানো ছিল আবশ্যিক।

আকবরের আমলে প্রদীপ জ্বালানি : প্রদীপ জ্বালানি, বাহক ও বাবুর্চিরা সারা বছর আগুন জ্বালিয়ে রাখতো একটি বিশেষ স্থানে। বছর শেষ হলে ওই আগুন তারা অন্য

পাত্রে সংরক্ষণ করতো। আবুল ফজল পাত্রটির নাম দিয়েছিলেন *'আগিনগির'*। প্রতি সন্ধ্যায় সূর্য ডোবার এক ঘড়ি (২৪ মিনিট) আগে আকবর যদি অশ্বপৃষ্ঠে থাকতেন তবে তিনিই প্রথম আগুন ধরাতেন, আর তিনি যদি ঘুমিয়ে থাকতেন তবে পরিচারকরা জাগিয়ে দিতো তাঁকে।

মোমবাতি জ্বালানি : সূর্যাস্তের সময় একজন জ্বালানি বারোটি সাদা মোমবাতি ধরিয়ে হাজির হতো সম্রাটের সম্মুখে। তখন একজন গায়ক সুরেলা কণ্ঠে গাইতো ঈশ্বরের প্রশস্তি, শেষে প্রার্থনা করতো সম্রাটের মঙ্গলময় শাসনকাল যেন অব্যাহত থাকে। আবুল ফজল লিখেছেন : "এই মোমবাতিগুলোর সৌন্দর্য ও আকৃতি—এর আলো-ছায়ার বিবরণ দেয়া এবং এগুলোর সঙ্গে জড়িত কর্মচারী ও শ্রমিকদের কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করা সত্যিই অসম্ভব।" এক গজ দীর্ঘ মোমবাতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দেয়া হয় আকবরকে, তবে একমাত্র আবুল ফজল ছাড়া অন্য কোনও সূত্রে এই তথ্যের সমর্থন মেলে না।

সুগন্ধি-প্রস্তুতকারী

হারেমগুলোতে সুগন্ধির গুরুত্ব ছিল অত্যধিক, এর প্রতি সকলের মনোযোগ ছিল গভীর। হিন্দু-হারেমে দাস-দাসীরা নিয়োজিত থাকতো হেনা প্রস্তুতের কাজে। মুসলিম-হারেমের মহিলাদের জন্য সুবাসিত তেল বানাতেন দক্ষ কারিগররা। তাঁরা ওই তেল মাখিয়ে চুল বাঁধতেন বিনুনি করে, তারপর সুগন্ধিও ছড়াতেন। দ্বাদশ শতকে কাশ্মিরের হারেমে বিশেষভাবে বাছাই করা বিশেষজ্ঞরা তৈরি করতেন জাফরানের কেশরাগ (কুমকুমলেপ)

মুগল হারেমে জনপ্রিয় 'গোলাপের আতর' সম্পর্কে বলা হয়, নুরজাহানের মা তাঁর হারেম-কর্মচারীদের সহায়তায় এটি উদ্ভাবন করেন। তাঁর তেলের দরকার ছিল। তাই গোলাপপানি জ্বাল দিলে উপরে তেল ভেসে ওঠে কিনা তা দেখতে চেয়েছিলেন পরীক্ষা করে। সে কাজ করতে গিয়েই আবিস্কৃত হয় এই পরম সুগন্ধি। মানুচচি বলেছেন অন্য কথা। নুরজাহান তাঁর স্বামীকে আপ্যায়ন করেছিলেন স্বগৃহে। আট দিন ধরে চলছিল খানাপিনা, ধুমধাম। হারেম, উদ্যান ও প্রাসাদের ভেতরকার সকল চৌবাচ্চা পূর্ণ করা হয়েছিল গোলাপপানিতে। সেখানে হাত ধুতে বারণ করা হয়েছিল সবাইকে। এক চৌবাচ্চার পাশে নুরজাহান ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙার পর তিনি দেখেন চৌবাচ্চার গোলাপপানিতে তেলতেলে কি ভাসছে। ভাবলেন, কেউ হয়তো চর্বিজাতীয় কিছু ফেলেছে। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দাস-দাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন নুরজাহান, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। পরে ওই তেল পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি শুঁকে দেখেন, চমৎকার সুগন্ধ। এই আবিষ্কারে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার মতো অবস্থা হয় তাঁর, ওই তেল নিজের সর্বাঙ্গে মেখে তিনি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ঘুমন্ত জাহাঙ্গিরকে। জেগে উঠে জাহাঙ্গিরও আপ্লুত হন ওই সুগন্ধি-মহিমায়। মানুচচি লিখেছেন : 'এভাবেই গোলাপ-নির্যাসের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় হিন্দুস্থানে।' কিন্তু সবাই জানেন, এ-নির্যাস উৎপন্ন হয়েছে এর কয়েক শ' বছর আগেই।

মশাল

অধিকতর আলোর জন্য মশাল ব্যবহৃত হতো আকবরের প্রাসাদে। এই তেলের দীপগুলোর প্রত্যেকটিতে সলতে থাকতো অনেকগুলো করে। প্রত্যেক চান্দ্রমাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রজনীতে (আকাশে যখন চাঁদ থাকে ক্ষণকালের জন্য) পোড়ানো হতো আটটি করে সলতে। চতুর্থ থেকে দশম রজনী পর্যন্ত প্রতি রাতে এর সংখ্যা হ্রাস পেতো একটি করে। দশম রজনীতে চাঁদ যেহেতু অনেক বেশি উজ্জ্বল থাকে, তাই একটি সলতেই যথেষ্ট মনে করা হতো। এ-ব্যবস্থা চলতো পঞ্চদশ রজনী পর্যন্ত। ষোড়শ থেকে উনবিংশ রজনী পর্যন্ত আবার একটি করে বেড়ে চলতো প্রতি রাতে। বিংশ রজনীতে সলতের সংখ্যা উনবিংশ রজনীর সমানই থাকতো। একবিংশ ও দ্বাবিংশ রজনীতে একটি করে বাড়তো, এবং ত্রয়োবিংশ রজনী থেকে পরবর্তী নয় রাত প্রতিটি মশালে আটটি করে সলতে জ্বলতো, প্রতিটির সলতের জন্য এক সের করে তেল ও আধা সের করে তূলা নির্ধারিত ছিল। কর্মচারীদের ভাতা দেয়া হতো সলতের আকার হিসাব করে।

লণ্ঠন

শাহি ছাউনিগুলোতে আলোক-ব্যবস্থা তদারকের জন্য নিয়োগ করা হতো সৈন্যদের। এইসব ছাউনির সঙ্গে হারেমও থাকতো। আকবরের দরবারের সামনে ১৬টি দড়িতে বেঁধে ৪০ গজ উঁচু এক খুঁটি দাঁড় করানো হতো। ওই খুঁটির উপরে জ্বলতো এক বিশাল লণ্ঠন। একে বলা হতো 'আকাশদিহা' (আকাশদীপ)—যার উল্লেখ করেছেন বেরনিয়ের। অনেক দূর থেকে ওই আলো দেখা যেতো। তাতে সৈন্যরা বুঝতে পারতো শাহী ছাউনিটি কোথায়, তারপর পথ চিনে ফিরতে পারতো যে যার তাঁবুতে। ওই ধরনের লণ্ঠনের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য, কারণ রাতের বেলা ছাউনির লোকজনের পথ চিনে চলা ছিল এক কঠিন কাজ। মনসবদারের *অহড়ি* ও অন্যান্য সৈন্য নিয়োজিত হতো ওই বিভাগে। পদাতিক সৈন্যদের ভাতা কখনও ৮০ দম-এর কম ও ২,৪০০০ দম-এর বেশি হতো না। আকাশদিহা জ্বালিয়ে রাখার প্রথা অব্যাহত ছিল আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত।

মোমবাতি

আওরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত আরও একটি মুগলপ্রথা অব্যাহত ছিল— মোমবাতি ব্যবহার এবং এ কাজে কর্মচারী নিয়োগ। মানুচচি লিখেছেন, মুগল সাম্রাজ্যে যে মোম প্রস্তুত করা হতো তা খাঁটি ছিল না। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বড়-বড় নৌকায় করে এগুলো পাঠানো হতো রাজধানীতে। ওই মোম দ্বারা হারেমের জন্য বাতি প্রস্তুত করা হতো, এ ছাড়া তা ব্যবহৃত হতো তাঁবুর কাপড়ের আস্তরণ হিসেবে। বিশেষ কারণে ওই মোমের সঙ্গে গন্ধক মেশানো হতো ; তবে ওই কারণটি আর ব্যাখ্যা করেন নি মানুচচি। অনুমান করা যেতে পারে, যৌন-তাড়না নিবৃত্ত করার জন্য হারেমের রমণীরা

যাতে ওগুলোর অপব্যবহার না করতে পারে সেজন্য অমন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। অনেক কাল আগে ওই কারণেই বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্য লিঙ্গাকৃতির দীপ ও ফল-মূল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন হারেমের জন্য।

রন্ধনশালা

হারেম-প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে দেখলে রাজকীয় রন্ধনশালার দু'ধরনের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। একটি দিক হলো—হারেম থেকে দাসী নিয়োগ, অপরটি হলো—রাজার জীবনের প্রতি সম্ভাব্য হুমকি।

সেই আদিকাল থেকে রাজকীয় রন্ধনশালায় নিয়োজিত পাচিকাদের রাখা হতো সন্দেহের বাইরে। হিন্দু ও মুসলিম রন্ধনশালায় পাচিকা নিয়োগের প্রথা ছিল বরাবরই। রন্ধনশালা ছিল প্রাসাদ ও হারেমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। জেনানা ও শাহি পরিবারের জন্য আহার্য প্রস্তুত হতো সেখানে, আর খাদ্যশস্য আসতো দূর-দূরান্ত থেকে। বিজনগরের সম্রাট যখন ভোজনের ইচ্ছা করতেন তখন রন্ধনশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে সেই স্থান ত্যাগ করতো, সেখানে আসতো কয়েকজন রমণী—যাদের দায়িত্ব ছিল 'তাঁর জন্য আসন প্রস্তুত করা'। স্বর্ণনির্মিত গোলাকার এক তেপায়া টুলের ওপর তারা খাদ্য পরিবেশন করতো সোনার থালায় ও পাত্রে। কোনও-কোনও পাত্র মূল্যবান রত্নেও খচিত ছিল। টুলের ওপর কোনও কাপড় বিছানো হতো না, তবে রাজার ভোজনশেষে হাত-মুখ ধোয়ার পর একখণ্ড কাপড় আনা হতো। রাজাকে খাবার পরিবেশন করতো ওই রমণী ও খোজারা। কড়া প্রহরাবেষ্টিত রাজকীয় রন্ধনশালার ভেতরে 'খোজা ও রমণীরা ছাড়া' আর কেউ থাকতে পারতো না।

রত্নখচিত সোনার থালায় রাজাকে খাওয়ানোর বর্ণনা এর আগে দিয়েছেন মেগাস্থিনিস। এর পুনরুল্লেখ করেছেন স্ত্রাবো। ওই বিবরণ পূর্বাব্দ চতুর্থ শতকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রাসাদের। উৎসবের শোভাযাত্রায় জমকালো পোশাক পরা পরিচারকরা 'বৃহদায়তন সোনার পাত্র ছাড়াও রাজাসন, পানপাত্র প্রভৃতি বহন করতো—এর বেশির ভাগই ছিল স্বর্ণ ও রত্নখচিত তাম্র-সামগ্রী'। মেগাস্থিনিসের এই বিবরণের সঙ্গে কৌটিল্যের বর্ণনা মিলে যায়।

মূল্যবান রত্নখচিত সোনার পাত্র ব্যবহারের প্রথা মুগল রাজত্বকালেও প্রচলিত ছিল। আকবরের রাজকীয় রন্ধনশালায় সম্রাটকে আহার্য পরিবেশন করা হতো স্বর্ণ ও রৌপ্যের থালায়, পাথর ও মাটির পাত্রে। ভোজনশেষে বাসন-কোসন রাখা হতো ধুয়ে মুছে। সোনা ও রুপার থালাগুলো বেঁধে রাখা হতো লাল কাপড়ে, আর সাদা কাপড়ে বেঁধে রাখা হতো চীনামাটি ও তামার পাত্রগুলো। আওরঙ্গজেবের রন্ধনশালায়ও 'স্বর্ণদানিতে চীনামাটির পাত্রে খাদ্য' পরিবেশন করা হতো। রন্ধনশালার কর্মচারীদের সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক খাদ্যসামগ্রী পরিবেশন করতে হতোই, 'এই নিয়ম এত কড়াকড়িভাবে পালন করা হতো যে শেষ পর্যন্ত ব্যয়-বরাদ্দের ওপর আর নিয়ন্ত্রণ থাকতো না'। তবে মহলের বেগম, শাহজাদি ও অন্য মহিলারা তাঁদের রন্ধনশালা

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পেতেন আলাদা ভাতা। আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহ্ আলম পিতার প্রিয়পাত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে সবসময় পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি তীব্র বিরাগ প্রকাশ করতেন। নির্দেশ দিয়ে নিজের জন্য তিনি কাঠের বাসন-কোসনও তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু পারস্য ও ইউরোপের মদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল তাঁর। সুরাট থেকে সে সব তিনি গোপনে কিনিয়ে আনতেন। একদিন মাতাল অবস্থায় তাঁকে মানুচচি বলতে শুনেছেন 'পান্না-জহরতের পাত্রে যে ভোজন করে না সে আবার রাজা নাকি!'

বিষাতঙ্ক

রাজকীয় রন্ধনশালায় রাজা-রানীদের বিষপ্রয়োগে হত্যার আতঙ্ক ছিল সবসময়েই। এ আতঙ্ক সুপ্রাচীনকালেও ছিল। পূর্বাব্দ ৪র্থ শতকে প্রধান পাচক (মহানাসিক) রন্ধন-ব্যবস্থা তদারক করতেন সরাসরি। রাজার জন্য প্রস্তুত অন্ন প্রথমে আগুনে ও পরে পাখিদের দেয়া হতো খেতে। অন্নে বিষ থাকলে আগুন থেকে নীল ধোঁয়া বেরোতো, আর খাওয়ার পর পাখিরা মারা যেতো। মদ ও অন্যান্য পানীয় রাজা-রানীকে পরিবেশনের আগে পাচক ও সরবরাহকারী (পোষক) কর্তৃক পরখ করার বিধান ছিল।

রাজপরিবারে ষড়যন্ত্র ও বিষপ্রয়োগের ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কলষ যখন শ্রীনগরের অধিপতি (১০৬৩-'৮৯) তখন তার মন্ত্রী নোনক তাঁকে পরামর্শ দেন, 'আপনি হয় নিজে অথবা কাউকে দিয়ে পুত্র হর্ষকে হত্যা করুন অথবা অন্ধ করে দিন।' ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরে কলষ হারেমের এক রমণীর মাধ্যমে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা চালান। বল্লপুরের অধিপতি টুক্কা'র পৌত্রীদের মধ্যে সুগগল শ্বশুর কলষের আনুকূল্য পেয়ে স্বামী হর্ষকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সে ও নোনক এক পাচককে দিয়ে হর্ষের খাদ্যে বিষ মেশানোর পরিকল্পনা নেয়। কিন্তু অন্য পাচকের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে যায় হর্ষের ভৃত্য প্রয়াগ। সে তার প্রভুকে নোনক ও সুগগলের পাঠানো খাবার খেতে নিষেধ করে। ওই খাবার দু'টি কুকুরকে খাওয়ানো হয়, তারা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়। এরপর হর্ষ সিদ্ধান্ত নেন, কোনও খাদ্যই তিনি স্পর্শ করবেন না। পিতা কলষ তাঁকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছেন অনুমান করে তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করেন।

এরপর থেকে তাঁর জন্য পাঠানো খাবার হর্ষ কোনওমতে স্পর্শ করতেন, কখনও মুখে তুলতেন না। তবে প্রয়াগ কর্তৃক বাইরে থেকে সংগৃহীত খাবার খেয়ে তিনি জীবনধারণ করতে থাকেন। পাচকদের কাছ থেকে রাজা কলষ যখন এই খবর শোনেন তখন প্রয়াগকে ডেকে পাঠিয়ে এর কারণ জানতে চান। খাদ্যে বিষ মেশানোর পুরো ঘটনাটাই প্রয়াগ বর্ণনা করে, তবে দুই ষড়যন্ত্রকারী ও পাচকের বিষয়টি গোপন রাখে। সে আরও জানায়, এসব ঘটনার কোনও কিছুই হর্ষ জানেন না। পরে কলষ সকল পাচক পরিবর্তন করেন, কিন্তু প্রয়াগ কর্তৃক আনীত খাবার ছাড়া রাজকীয় রন্ধনশালা থেকে পাঠানো কোনও কিছুই খেতেন না হর্ষ।

মুগল আমলেও একই ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছিল। আকবরের রন্ধনশালা থেকে জেনানা মহলে খাবার পাঠানো শুরু হতো সেই ভোরে, এ কাজ চলতো গভীর

রাত পর্যন্ত। রন্ধনশালার নিয়ন্ত্রণভার ছিল মীর কয়াল আখ্যাত একজন কর্মকর্তার ওপর, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি-ক্ষমতার ওপরই নির্ভর করতো ওই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য। তিনি যাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য 'কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি' সহযোগিতা করতো তাঁকে। সম্রাটের কক্ষে খাবার পাঠানোর আগে পাচক ও মীর কয়াল তা চেখে দেখতেন। আওরঙ্গজেবের জন্য পাঠানো খাবার প্রথম চাখতেন তাঁর বোন রোশন আরা। এমন আনুগত্য সত্ত্বেও তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। আহারশেষে আওরঙ্গজেব গভীর আনুকূল্য দেখাতে অবশিষ্ট খাবার পাঠিয়ে দিতেন বেগম, শাহজাদি ও সান্ত্রিদলের অধিনায়কদের কাছে। যে খোজারা খাবার বয়ে আনতো তাদেরও তিনি বখশিশ দিতেন প্রচুর।

ব্যভিচার

দেশে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকতো না, তখন হারেম হয়ে উঠতো লাম্পট্য, ব্যভিচার, চক্রান্ত ও কুকর্মের এক তপ্ত ভূমি। হারেম-জীবনের ওই সব কাহিনী পরবর্তীকালের অতিরঞ্জিত ইতিকথা নয়, এগুলোর সত্যতার প্রমাণ মেলে প্রাক-বৌদ্ধ আমল থেকেই।

ওই আমলে লাম্পট্যের মাত্রা প্রায় সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একটি বিশেষ ঘটনা হিসেবে এ প্রসঙ্গে রানী সুস্‌সোন্দির কাহিনীটি উল্লেখ করা যায়।

অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী সুস্‌সোন্দি ছিলেন বারাণসীর রাজা তম্ব'র প্রধান মহিষী। ওই সময়ে তরুণ গরুড়রূপে জন্মগ্রহণ করেন বোধিসত্ত্ব। তিনি বসবাস করতেন সেরুমা (সুমাত্রা?) নামের নাগ দ্বীপে। ছদ্মবেশে বারাণসীতে গিয়ে তিনি পাশা খেলেন রাজা তম্ব'র সঙ্গে। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করে সুস্‌সোন্দি-কে। পরে তাঁরা একে অন্যের প্রেমে বিমোহিত হন। সুস্‌সোন্দি'র সঙ্গসুধা উপভোগ করতে গরুড় তাঁকে নিয়ে যান সেই দ্বীপে। রাজা তখন রানীর খোঁজে পাঠান তাঁর অমাত্য সগ্ন-কে। খুঁজতে-খুঁজতে শেষ পর্যন্ত এক সমুদ্রতীরে তাঁর দেখা পায় সে। গরুড় তখন সেখানে ছিলেন না। সগ্নকে চিনতে পেরে সুস্‌সোন্দি তাই তাকে নিয়ে যান দ্বীপের প্রাসাদে। পরে দু'জনে মিলিত হন প্রমত্ত কামলীলায়। বারাণসীতে ফিরে সগ্ন সব ঘটনা খুলে বলে গরুড়ের কাছে। তখন দ্বীপে ফিরে যান গরুড়। তিনি বুঝতে পারেন, সুস্‌সোন্দিকে তিনি যথাযোগ্যরূপে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এরপর তিনি বারাণসীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন তাঁকে। এরপর আর কখনও দেখা করেন নি তাঁর সঙ্গে।

মগধের রাজা বিম্বিসার (আনুমানিক ৪৫৬-৯৪ পূর্বাব্দ) ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রু (আনুমানিক ৪৯৪-৬২ পূর্বব্দ)-র সমকালে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন প্রদ্যোত (চণ্ড)। তিনি 'মহাসেনা' বা 'চণ্ড মহাসেনা' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর কন্যা বাসবদত্তা-কে প্রলোভিত করেছিলেন কৌসম্বী'র রাজা উদয়ন—যিনি জাদুর বাঁশি বাজিয়ে হাতিদের মোহিত করতে পারতেন। এই জাদুবিদ্যা জানতে আগ্রহে অধীর হয়েছিলেন প্রদ্যোত। এক কাঠের হাতি বানিয়ে তাতে ৬০ জন যোদ্ধাকে লুকিয়ে রেখে তিনি এক ফাঁদ পাতেন। তারপর বন্দি করেন উদয়নকে (ট্রয়ের ঘোড়ার কাহিনীর সঙ্গে

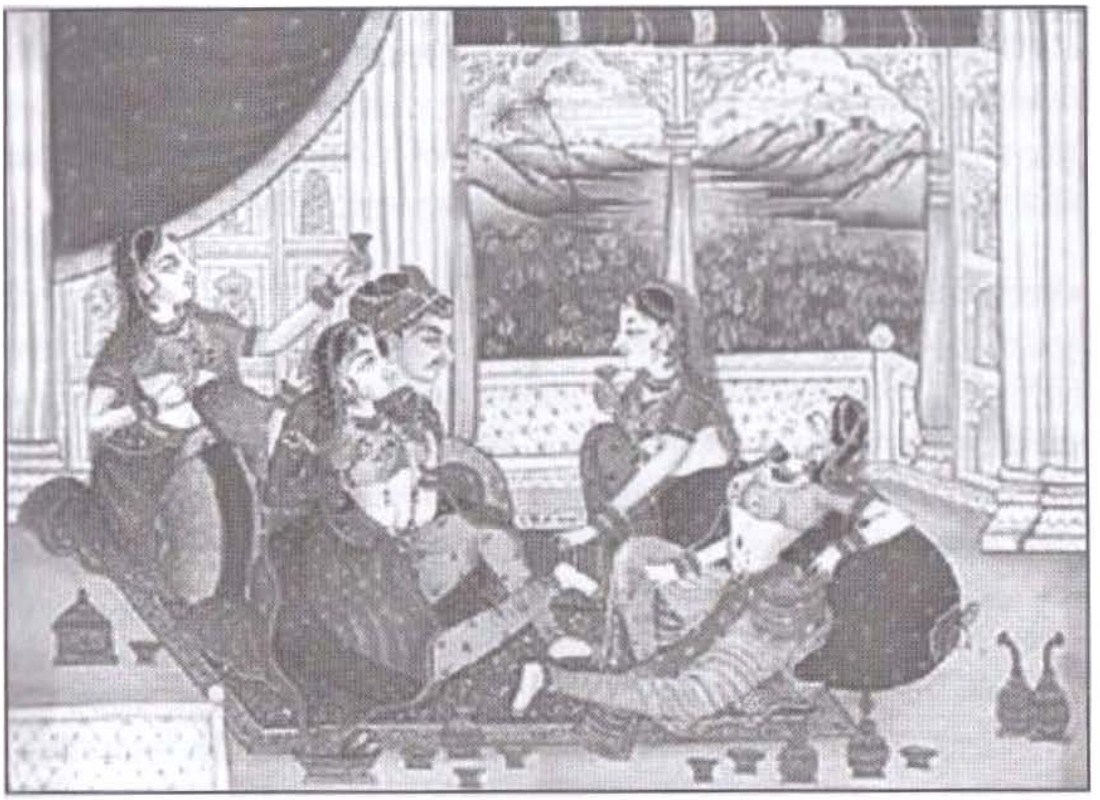

হারেম রমণীদের নিয়ে সম্রাট মেতেছেন ফূর্তিতে। শিল্পীর চোখে।

তুলনীয়)। পরে তাঁকে মুক্তি দিতে তিনি রাজি হন একটি শর্তে : বাসবদত্তাকে হাতি বশ করার জাদু শেখাতে হবে। উদয়ন রাজি হলে বাসবদত্তা একজন কুরূপা কুব্জা সেজে তাঁর কাছ থেকে জাদুবিদ্যা শিখতে থাকেন। কিন্তু শেখার ক্ষেত্রে বাসবদত্তার মন্থরতায় ধৈর্যচ্যুত হয়ে একদিন উদয়ন তাঁকে 'গবা কুঁজি' বলে গাল দিলে বাসবদত্তাও তাঁকে 'দুর্জন কুষ্ঠি' বলে তিরস্কার করেন। রাগারাগির সময়ে ছাত্রী ও শিক্ষকের মাঝখানের আড়ালটা সরে যায়, তখন একে অন্যকে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে তাঁরা পরস্পরের প্রেমে পড়েন এবং পালিয়ে কৌসম্বী চলে যান। বাসবদত্তা ছাড়াও উদয়নের পত্নী ছিলেন আরও কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে মগন্দিয়া, সমাবতী, গোপালমাতা, পদ্মাবতী, অরণ্যকা ও সাগরিকা'র উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন কাহিনীতে।

ওই যুগে কয়েকজন সভাসুন্দরীর বিশেষ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-বিদেশে। তাদের একজন ছিল সুন্দরী আম্রপালী। তাকে পাওয়ার জন্য লিচ্ছবি বংশীয় তরুণ রাজারা রীতিমতো যুদ্ধে লিপ্ত হয় পড়েছিলেন। শেষে রাজপরিষদ আম্রপালীকে বৈশালীর একক নগরশোভিনী নিযুক্ত করে। প্রতি রাতে আপ্যায়নের জন্য তাকে পারিশ্রমিক দিতে হতো ৫০ কাহপণ করে। ক্রমে আম্রপালী এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, তার কারণেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে বৈশালী নগরী। এতে উৎসাহিত হয়ে রাজা বিম্বিসার তাঁর রাজধানী রাজগৃহ-এর নগরশোভিনী নিযুক্ত করেন উজ্জয়িনী থেকে আনা পদ্মাবতীকে।

বিম্বিসারের পত্নী ছিল একাধিক। তাদের মধ্যে মদ্দ (মাদ্রী), চেল্লনা, পদ্মাবতী, নন্দা, খেমা প্রমুখের নাম জানা যায় বিভিন্ন উপাখ্যানে। তবে আম্রপালীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। তার সঙ্গে প্রায়ই তিনি রাত কাটাতেন। আম্রপালীর ঔরসে কোন্দন্ন নামে এক পুত্র জন্মেছিল তাঁর। পদ্মাবতীর গর্ভেও অভয় নামে আরেক পুত্র জন্মেছিল তাঁর। কোন্দন্ন পরে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হয়।

নগরশোভিনী

বুদ্ধের সময়কালে কোনও-কোনও নগরীতে একজন করে বিশেষ বারবনিতা থাকার প্রথা ছিল। তার পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম এমন সকল নগরবাসীর সম্পত্তি ছিল সে। রাজগৃহের নগরবধূ হিসেবে পদ্মাবতীকে যে বিম্বিসার নিযুক্ত করেছিলেন, তার কারণ এক বণিকের পরামর্শ। আম্রপালীর কারণে বৈশালী নগরীর কি সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা ওই বণিক প্রত্যক্ষ করে এসেছিল। তার পরামর্শ গ্রহণ করেন বিম্বিসার এবং তাকেই দায়িত্ব দেন রাজগৃহের জন্য উপযুক্ত নগরবেশ্যা খুঁজে আনার। তখন সলাবতী নামের এক সুন্দরী তরুণীকে ওই বণিক রাজগৃহের জন্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু সলাবতী হয়ে পড়ে আম্রপালীর চেয়েও বেশি ব্যয়বহুল, যদিও তার খ্যাতি ছিল না অত। প্রতি রাতের জন্য সে পারিশ্রমিক নিতো ১০০ কাহপণ করে। আম্রপালীকে যখন বৈশালীর 'নগরশোভিনী' নিযুক্ত করা হয় তখন তার বসবাসের জন্য বিশাল এক ভবন ছাড়াও তাকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল : সপ্তাহে একবার ছাড়া কেউ তার আঙিনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

নগরশোভিনীপ্রথা এই ইঙ্গিতই দেয় যে সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য কলায় নিপুণ সুন্দরী নারীদের জনপদবধূ হিসেবে নিয়োগ করা যেতো—অর্থাৎ তারা হতো ওই নগরবাসীর সাধারণ সম্পত্তি, অর্থের বিনিময়ে তাদের দেহও উপভোগ করা যেতো। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (৪৮০-'৯০ পূর্বাব্দ)-এর মতে, এই প্রথাটি গোত্রীয়। তিনি উল্লেখ করেছেন, আউসেস গোত্রের নারীরা ছিল 'সাধারণ সম্পত্তি'; তাদের মধ্যে কোনও নর-নারী একত্রে বাস করতো না। তাদের কাছে যৌনমিলন ছিল সাময়িক ব্যাপার মাত্র। কোনও সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে গোত্রের সকলে মিলে বসতো আলোচনায়। গোত্রের যে ব্যক্তির সঙ্গে ওই সন্তানের অবয়বগত সাদৃশ্য বেশি থাকতো তাকেই গণ্য করা হতো পিতা। একই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল লিবীয় উপকূলের গোত্রগুলোর মধ্যে।

স্কিথিয়া'র আগাথ্রাইসি গোত্রের লোকজন সোনার অলঙ্কার পরতো। তাদের জীবনযাপন ছিল বিলাসবহুল। নারীদের তারা উপভোগ করতো সকলে মিলে। তাদের ধারণা ছিল, এতে সবাই তারা পরস্পরের ভাই হবে এবং এক পরিবারের সদস্য হিসেবে বসবাস করতে পারবে। এই প্রথা কিছু হেরফের হয়ে দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল থ্রেস-এ। সেখানকার লোকজন তাদের সন্তানদের অন্য দেশে রফতানি করতো, আর মনোমতো লোকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অনুমতি দিতো মেয়েদের। তবে অতি

উচ্চমূল্যে কেনা স্ত্রীদের প্রতি তারা সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। টিরেনিয়ান-দের মধ্যেও নারীরা বিবেচিত হতো সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে। এইসব এলাকার সঙ্গে ভারতের যথেষ্ট বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এতে মনে হয় ওইসব প্রথা ভারতীয় রাজাদের প্রভাবিত করেছিল বিশেষভাবে।

কুড়িয়ে পাওয়া শিশু

পূর্বাব্দ ৬ষ্ঠ শতকে 'নগরশোভিনী' প্রথা ও পতিতাবৃত্তির ব্যাপক প্রসার ঘটায় অনেক অবৈধ সন্তানের জন্ম হতো। তাদের বেশির ভাগকেই ছুড়ে ফেলা হতো আস্তাকুঁড়ে। এমন এক পরিত্যক্ত শিশু ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ জীবক, যার পিতা ও মাতার পরিচয় ছিল অজ্ঞাত। প্রাচীন বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভবত তিনি ছিলেন কোনও নর্তকী বা পতিতার সন্তান ; গোবরের গাদায় তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল, আর অসংখ্য কাক তাঁকে ঠোকরাচ্ছিল। রাজপুত্র অভয় কুমার ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপারটা কি জানতে ঘটনাস্থলে লোক পাঠান। তারা ফিরে এসে বলে, একটি শিশু পড়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, জীবিত? (বেঁচে আছে?) তারা বলে, হ্যাঁ। আর এভাবেই শিশুটির নাম হয় জীবক। তাঁকে প্রাসাদে নিয়ে যান অভয়, তারপর ধাত্রীদের নির্দেশ দেন—এই ছেলেকে লালন-পালন করো। এজন্যে তাকে ডাকা হতো *কুমারেন পোষপিত কুমারবাচ্চা* (রাজপুত্র কর্তৃক পালিত শিশু) নামে।

বড় হয়ে তিনি দেখা করতে যান তাঁর পালনকর্তার কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কে আমার মাতা, হে রাজন্, কে আমার পিতা?' রাজপুত্র উত্তর দেন, 'তোমার মাতা কে তা আমি জানি না। হে বৎস জীবক, তবে আমিই তোমার পিতা—কারণ আমি তোমাকে পালন করেছি।' অবৈধ সন্তান হলেও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে কোনও অসুবিধা হয় নি জীবকের। সেখানে চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে তিনি সাত বছর অধ্যয়ন করেন, পরে চিকিৎসাবিদ্ হিসেবে দেশবিখ্যাত হন। তাঁর মা ছিলেন সলাবতী নামের এক সভাসুন্দরী। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকেই তিনি খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন রাজানুগ্রহ হারানোর আশঙ্কায়। তাই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি এক দাসীকে ডেকে বলেন, 'যাও, শিশুটিকে ওই পুরনো ঝুড়িতে করে নিয়ে বাইরের কোনও গোবর-গাদায় ফেলে আসো।'

জীবকের মতো অত খ্যাতিমান না হলেও গোশক ছিলেন অনেক বেশি সৌভাগ্যবান। তিনি ছিলেন এক সভাসুন্দরীর সন্তান, তাঁকে ফেলে দেয়া হয়েছিল এক জঞ্জালের স্তূপে, সেখান থেকে এক পথিক কুড়িয়ে নিয়েছিল তাঁকে। কোসম্বী রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ এক জ্যোতিষীর কাছে শুনেছিলেন এক সৌভাগ্যবান পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে। তাই খুঁজে-খুঁজে গোশককে পেয়ে তিনি দত্তক নেন তাঁকে। কিছুদিন পর কোষাধ্যক্ষের স্ত্রী এক পুত্রসন্তান প্রসব করে। তখন কালী নামের এক দাসীর মাধ্যমে গোশককে হত্যার চেষ্টা করেন তিনি। তবে গোশক বেঁচে যান কোনও ভাবে। পরে পালকপিতার ধনসম্পদের উত্তরাধিকারী হন তিনি ।

তিষ্যরক্ষিতা

তিষ্যরক্ষিতা ছিলেন সম্রাট অশোক (পূর্বাব্দ তৃতীয় শতক) এর অন্যতম পত্নী। অশোকের অন্য পত্নীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দেবী, প্রধান রানী কারুবাকি ও দ্বিতীয় রানী পদ্মাবতী। তিষ্যরক্ষিতা ছিলেন তৃতীয় রানী। অসন্ধিমিতা নামে আরেকজন রানীর নামও পাওয়া যায় প্রাচীন বিবরণীতে। তাঁর স্থান ছিল তিষ্যরক্ষিতার আগে।

তিষ্যরক্ষিতা সম্পর্কে একটি কাহিনী রয়েছে 'দিব্যবদন' এবং এই ধরনের বিভিন্ন সংস্কৃত-বৌদ্ধ গ্রন্থে। কাহিনীটি অবশ্য 'দীপবংশ' (পূর্বাব্দ ৪র্থ শতক) ধরনের আগেকার পালি গ্রন্থগুলোতে নেই। ওই কাহিনীতে বলা হয়েছে, তিষ্যরক্ষিতা ছিলেন অতিশয় জঘন্য এক ব্যাভিচারিণী ; সৎপুত্র কুনাল (ধর্মবর্ধন নামেও পরিচিত) ও সুযশ (পদ্মাবতীর পুত্র)-কে তিনি প্ররোচিত করেছিলেন তাঁর সঙ্গে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। সীমান্তবর্তী গোত্রগুলোর বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে কুনালকে পাঠানো হয়েছিল তক্ষশিলায়। তখন তাঁর সঙ্গে যৌনসংসর্গে মিলিত হতে সকল কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন তিষ্যরক্ষিতা। কিন্তু কুনাল রাজি হন নি কিছুতেই। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিষ্যরক্ষিতা মিথ্যা খবর পাঠান স্বামীর কাছে : কুনাল নাকি নিষ্ঠুররূপে বলাৎকার করেছে তাঁকে। ক্ষিপ্ত হয়ে অশোক তখন কুনালকে অন্ধ করে নির্বাসনে পাঠান। আধুনিক পণ্ডিতগণ এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলেও সেকালের অনেক বৌদ্ধ উপকথায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

'মহাপদুমা জাতক'-এ অনেকটা এ-ধরনেরই একটি কাহিনী রয়েছে। বারাণসীর রাজা প্রদত্ত সীমান্ত অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করতে যাওয়ার সময় ছেলে পদুমাকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন প্রধান রানীর ওপর। রাজা যখন ফিরে আসছেন তখন পদুমা তাঁকে স্বাগত জানাতে অধীর হয়। অনুমতি নিতে সে যায় বিমাতার কাছে। তখন তার রূপ দেখে রানী বিমোহিত হন। বিদায় নেয়ার সময় পদুমা জিজ্ঞেস করে, 'মা, তোমার জন্য কি কিছু করতে পারি?'

রানী বলেন, 'আমাকে মা বলে ডাকলে?' তারপর তার দু'হাত চেপে ধরে তিনি বলেন, 'এসো, আমার বিছানায় এসো!' 'কেন?' সে জানতে চায়।

রানী উত্তর দেন, 'যতক্ষণ না রাজা আসেন ততক্ষণ, এসো, আমরা প্রেমের সুধা পান করি।'

পদুমা রেগে বলে : "তুমি সম্পর্কে আমার মা। তোমার স্বামী জীবিত রয়েছেন। মাতৃসমা কোনও নারী যে কাম-লালসায় অধীর হয়ে নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। কি করে তোমার সংসর্গে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব?"

দু'-তিন বার অনুনয়ের পরও পদুমা যখন অবিচলিত থাকে তখন রানী চিৎকার করে ওঠেন, 'তা হলে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করছো?'

'অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করছি।'

'তা হলে রাজাকে বলে তোমার শিরচ্ছেদ ঘটাবো আমি।'

'তোমার যা খুশি করো'—বলে সে চলে যায়।

এরপর রানী অসুস্থতার ভান করেন, নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে খাদ্যগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং রাজাকে বলেন, পদুমা তাঁকে মারধর করেছে—কারণ তাঁর কুপ্রস্তাবে রাজি হন নি তিনি! শুনে রাজা আর সত্যাসত্য যাচাই করেন না, পদুমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন তস্করশৃঙ্গ থেকে। তবে এক পার্বত্য দেবী রক্ষা করেন তাকে। পরে সে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। একসময় রাজা চিনতে পারেন তাকে। তখন পদুমা আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করে। এরপর রাজা দুষ্ট রানীকে ছুড়ে ফেলেন সেই শৃঙ্গ থেকে।

'দিব্যবদন' ও 'জাতক'-এর কাহিনীতে অমিল শুধু এইটুকু যে, কুনালকে অন্ধ করা হয়েছিল আর পদুমা-কে ফেলে দেয়া হয়েছিল শৃঙ্গ থেকে। ঘটনাটি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে অনেক রানীর স্বামী সম্রাট অশোকের অন্তঃপুরে নিশ্চয়ই ছি-ছি পড়ে গিয়েছিল।

শিশুনাগ

রাজকীয় হারেমে ব্যভিচার-সংক্রান্ত নানা ঘটনা ঘটতো, তবে যথেষ্ট টি-টি পড়ে গেলেই শুধু তা স্থান পেতো পরবর্তী কালের বিবরণীতে। ৪র্থ শতকে প্রণীত 'মহাবংশ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, অজাতশত্রু থেকে নাগ দশক পর্যন্ত সকল রাজাই ছিলেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের হত্যাকারী। মগধের রাজধানী রাজগৃহের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো রাজপরিবারকেই তাড়িয়ে দেয়, তারপর বারাণসীতে রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত শিশুনাগ (শৈশুনাগ) নামের এক অমাত্যকে সিংহাসনে বসায়। 'মহাবংশটীকা'য় বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন বৈশালীর এক লিচ্ছবি রাজা ও এক নগরশোভিনীর সন্তান, তাঁকে লালন-পালন করেছেন রাজ্যের এক কর্মকর্তা। আনুমানিক ১৪৪ থেকে ৩৯৬ পূর্বাব্দকালে তিনি রাজত্ব করে গেছেন। সেকালে ব্যভিচার এত সাধারণ ব্যাপার ছিল যে, জারজ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাজা পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন। তাঁর মায়ের পরিচয় পাওয়া যায় নি, তবে অনুমান করা যায় আম্রপালী, অম্বকাসী, পদ্মাবতী প্রমুখ সেকালের নামী বেশ্যাদের মতোই কোনও একজন ছিলেন তিনি।

নন্দ বংশ

শিশুনাগ বংশীয় রাজাদের উচ্ছেদ করেন নন্দ বংশীয়রা। এই বংশের প্রথম রাজা নন্দ ('মহাপদ্ম' বা 'মহাপদ্মাপতি' নামেও পরিচিত)-এর জন্মবৃত্তান্তও কলঙ্কিত। 'পুরাণ' গ্রন্থগুলোতে নন্দকে উল্লেখ করা হয়েছে শূদ্র হিসেবে। প্রথম দিককার এক মগধ রাজার সঙ্গে এক শূদ্র রমণীর মিলনের ফলে তাঁর জন্ম হয়। 'মহাবোধিবংশ' গ্রন্থে এজন্যই তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে উগ্রসেন নামে। গ্রিক লেখক কারটিয়াস তাঁর নাম লিখেছেন ইয়ান্দ্রামেস বা আগ্রামমেস—যার অর্থ দাঁড়ায় নন্দ বা ঔগ্রসেন ('উগ্রসেনের পুত্র')। তিনি অনুমান করেছেন, নন্দ একসময় নাপিত ছিলেন। তাঁর রাজা হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কারটিয়াস লিখেছেন, আলেকজানডারের আক্রমণ-অভিযানকালে

অগ্রামমেস নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর পিতা বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজা (সম্ভবত শিশুনাগের পুত্র কালাশোক অথবা কাকবর্ণ)-কে হত্যা করেছিল।

পূর্বাব্দ ষষ্ঠ শতক

প্রাচীন বিবরণীগুলোতে অনেক লম্পটের কাহিনী পাওয়া যায়। এক ব্রাহ্মণকুমারীর প্রতি লালসা প্রকাশ করে ভোজ ('দণ্ডক্য' নামেও পরিচিত) শুধু সিংহাসন হারান নি, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন আত্মীয়-স্বজন সহ। এই পরিণতির বিষয়টি বাৎসায়ন (৪র্থ-৫ম শতক)-ও উল্লেখ করেছেন। কন্যার অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গব অভিশাপ দিয়েছিলেন দণ্ডক্যকে, পরে তাঁর রাজত্ব বিলীন হয়ে যায় ধূলিঝড়ের নিচে।

সেকালের আরেক কুখ্যাত লম্পট তালজঙ্ঘ (অবন্তী'র বংশধর)। তাঁর পিতা ছিলেন অর্জুন কর্তবীর্য (যদুবংশের খ্যাতিমান পুরুষ হৈহয়-এর বংশধর)। রাজা ভোজ-এর মতো তালজঙ্ঘও সর্বদা মগ্ন থাকতেন কামলীলায়। শেষে ভৃগু বংশীয়দের অপমান করে তাদের অভিসম্পাত কুড়িয়ে তিনিও নিপাত যান সবংশে।

হৈহয় বংশীয়রা ছিলেন কুখ্যাত যৌন-উন্মাদ। ওই বংশের দম্ভোদ্ভব ও অর্জুন নামের দু'জনের কামুকতায় অতিষ্ঠ হয়ে সকল প্রজা ঐক্যবদ্ধ হয়ে হত্যা করে তাঁদের। আরও দুই কুখ্যাত লম্পট ছিলেন উল ও করল। কৌটিল্য কর্তৃক বর্ণিত এই ঐল যদি ঋগ্বেদ-এ উল্লিখিত পরীক্ষিৎ-এর পূর্বপুরুষ পুররবা ঐল হয়ে থাকেন তবে উর্বশীর সঙ্গে তার প্রেমের কাহিনী কারও না অজানা থাকার কথা নয়।

বৈদেহ বংশীয় করল (করল জনক নামেও পরিচিত) এক ব্রাহ্মণকন্যার রূপে এতই মজেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাকে অপহরণ করেন তিনি। এতে জাত খোয়ালেও কাম-লালসা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকেন নি কখনও। এই ঘটনার সূত্রেই বৈদেহ বংশীয়দের উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা করা হয় উজ্জয়িনী মিত্রসংঘ।

শতকর্ণী ও অন্যান্য

সেকালের কয়েকজন উৎকামুকের কাহিনী বাৎস্যায়ন উল্লেখ করেছেন, তবে তাদের বংশানুক্রমিক পরিচয় পাওয়া যায় নি। পাঞ্চাল-এর এক রাজা সংগমকালে এক শূলাকৃতি দণ্ড দিয়ে হত্যা করেছিলেন মাধবসেনা নামের এক সভাসুন্দরীকে। নারীহত্যার এটি ছিল এক বিশেষ পদ্ধতি। আরেক অস্ত্র ছিল কাঁচি। এই অস্ত্র ব্যবহার করে রাজা শতকর্ণী শতবাহন হারেমের ভেতরে হত্যা করেছিলেন তাঁর রানীকে। পুরাণ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই রাজা ছিলেন চুতু পরিবারের পূর্বসূরি কুন্তল (কর্ণাটক) বংশীয়। রাজা নরদেবের একটি হাত ছিল বিকল। এক ধারালো অস্ত্র দিয়ে তিনি অন্ধ করে দিয়েছিলেন এক নর্তকীকে। ঘটনাটি অন্তঃপুরে ঘটেছিল।

বাৎস্যায়ন পরামর্শ দিয়েছেন, কোনও রাজার অন্য বক্তির গৃহে বা হারেমে প্রবেশ করে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কোত্ত বংশীয় রাজা আভীর এক

নারীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন অন্যের গৃহে। তখন এক ধোপা হত্যা করে তাঁকে। একই ভাবে কাশীর রাজা জয়সেন নিহত হন তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর এক অধিনায়কের হাতে।

পূর্বাব্দ পঞ্চম শতক

সমুদ্র গুপ্তের পুত্র রাম গুপ্তের এক স্ত্রী ছিলেন ধ্রুবদেবী। হানাদার শক-অধিপতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁর রূপে। তাই খবর পাঠান, ধ্রুবদেবীকে পেলে তিনি রাজ্য আক্রমণ না করে চলে যাবেন। রাম গুপ্ত তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তখন তাঁর ছোট ভাই চন্দ্র গুপ্ত এগিয়ে আসেন এক কৌশল নিয়ে। তিনি ধ্রুবদেবীর বেশ ধারণ করে শক-শিবিরে প্রবেশ করেন, তারপর শত্রুকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে ফিরে আসেন বীরের মতো। পরে ভাইকে হত্যা করে তিনি বিয়ে করেন ধ্রুবদেবীকে। এ থেকে অন্তঃপুরে কি রকম ব্যভিচার চলতো তা সহজেই অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালের বিবরণীতে অবশ্য শত্রুহত্যার কীর্তিকেই শুধু তুলে ধরে ধন্য-ধন্য করা হয়েছে চন্দ্র গুপ্তকে।

সিন্ধু রাজ্য

৫৬২ অব্দে সিন্ধুর আলোর (রোরুব) ছিল রাজা সাহসী রাই-এর রাজধানী। রাজসংসারের সরকার রাজার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন চাচ নামের এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। সাহসীর রানী প্রেমে পড়েন চাচের, কিন্তু চাচ তা প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে রাজার বিশ্বস্ততা অর্জন করে তাঁর বিশেষ প্রিয়প্রাত্র হন তিনি। পরে রাজসংসারের সরকারের মৃত্যু ঘটলে চাচ ওই পদে আসীন হন, আর রাজার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীকে বিয়ে করে সিংহাসনে বসেন। এই বিধিবহির্ভূত রাজ্যলাভে সাহসী'র আত্মীয় জয়পুর (চিতোর?)-এর রাজা মহরত ক্ষুব্ধ হয়ে আলোর আক্রমণ করেন। বিমূঢ় চাচ তখন রানীর সঙ্গে সলাপরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা পোশাক বদলে ফেলবেন, আর মহরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রানী নিজে সৈন্য পরিচালনা করবেন। দুই পক্ষের সেনাবাহিনী যখন মুখোমুখি তখন মহরত এগিয়ে এসে আহ্বান জানান, উভয়ের বিরোধ যেহেতু নিতান্তই ব্যক্তিগত, তাই দ্বন্দ্বযুদ্ধ এর মীমাংসা হওয়া উচিত। উত্তরে চাচ বলেন, তিনি একজন ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, অশ্বচালনায় অক্ষম, কাজেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ মাটির ওপর দাঁড়িয়েই করা হোক। কোনও কিছু সন্দেহ না করে এই প্রস্তাবে মহরত রাজি হন সঙ্গে সঙ্গে। চাচ তখন ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেই বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন তাঁকে।

চাচের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র চন্দর। আট বছর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। এরপর সিংহাসনে বসেন দাহির (দধি রাজা)। তিনি বিয়ে বরেন চাচের কন্যা বাই-কে। চাচের এক পুত্র ধরসিয়া বোন বাই-কে দাহিরের কাছে পাঠিয়েছিলেন ভাটিয়ার রাজার কাছে বিয়ে দেয়ার জন্য। জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বাই-এর স্বামী হবেন হিন্দুস্থানের অধিপতি, তাই দাহির নিজেই বিয়ে করে বসেন তাঁকে।

সূর্যদেবী ও পরিমল দেবী

দধি রাজা (মুসলিম বিবরণীতে দাহির) যখন আরব অভিযাত্রী মুহম্মদ কাসিম কর্তৃক নিহত হন, তখন তাঁর দুই কন্যাকে আটক রাখা হয় অন্তঃপুরে, পরে তাদের পাঠানো হয় বাগদাদে। খলিফা প্রথম ওয়ালিদ (৭০৫-১৫) আদব-কায়দা শিখে নেয়ার জন্যে তাদের পাঠান তাঁর হারেমে। কিছুদিন পর দুই বোনকে এক রাতে হাজির করা হয় ওয়ালিদ-এর সামনে। তিনি জানতে চান দু'জনের মধ্যে কে বড়। দোভাষীর মাধ্যমে সূর্যদেবী জানান, তিনি বড় এবং পরিমল দেবী তার ছোট বোন। এ কথা শুনে পরিমলকে হারেমে ফেরত পাঠিয়ে দেন ওয়ালিদ এবং কামতৃষ্ণা নিয়ে কিছুক্ষণ সূর্যদেবীর দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁকে কাছে টেনে নেন। কিন্তু সূর্যদেবী নিজেকে আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকেন, জাঁহাপানা জিন্দাবাদ, কিন্তু বাদশাহের শয্যায় যাওয়ার উপযুক্ত আমি নই। কারণ এখানে পাঠানোর আগে সেনাপতি ইমাদুদ্দিন মুহম্মদ কাসিম আমাদের তিন দিন রেখেছিলেন তাঁর কাছে। আপনাদের মধ্যে হয়তো এটাই নিয়ম, কিন্তু আমি মনে করি বাদশাহের সঙ্গে এমন প্রতারণা করা সম্পূর্ণ অন্যায়।

ওয়ালিদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এ কথা শুনে, সঙ্গে-সঙ্গে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে নির্দেশ লেখেন—কাসিম যেখানেই থাকুক, কাঁচা চামড়ার ভেতর তাকে ভরে সেলাই করে রাজধানীতে পাঠানো হোক।

কাসিম তখন ছিলেন উধাফর (বিকানির-এর উধাপুর) নামক স্থানে। খলিফার নির্দেশ তিনি বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন। তাঁর মৃতদেহ যখন বাগদাদে পৌঁছয়, তখন চিরহরিৎ গুল্মগুচ্ছ হাতে খলিফা, তা দেখিয়ে সূর্যদেবী ও তাঁর বোনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'দেখ কন্যাগণ, আমার নির্দেশ সকলে কিভাবে পালন করে।' তখন সাধ্বী সূর্যদেবী বলেন, 'জাঁহাপনা, মুহম্মদ কাসিম কখনই লালসার হাত দিয়ে আমাদের স্পর্শ করেন নি। কিন্তু আমাদের পিতাকে তিনি হত্যা করেছেন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে তাঁর পত্নী লড়ি-কে কিনে নিয়ে তাঁকে স্ত্রীর মতো রেখেছেন, বলেছেন তাঁকে তিনি বিয়ে করেছেন, আমাদের অমাত্যদের কন্যাদের ধর্ষণ করা হয়েছে, রাজ্য ধ্বংস করে আমাদের দাসী বানানো হয়েছে। কাজেই প্রতিশোধ নিতে আমরা আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি। এখন আপনি যা ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন আমাদের।' অনেকে বলেন, ক্রুদ্ধ খলিফা দুই দেয়ালের মধ্যে তাঁদের আটকে রেখেছিলেন ; আবার অনেকে বলেন, দুই বোনকে ঘোড়ার লেজে বেঁধে সারা বাগদাদ শহর ঘোরানো হয়েছিল, পরে তাঁদের দেহাবশেষ ফেলা হয় দজলা (তাইগ্রিস) নদীতে।

১৩শ শতাব্দীতে রচিত 'চাচনামা'য় উল্লিখিত এই বিবরণীটি হয়তো কিংবদন্তি মাত্র, তবে এতে সত্যের কিছুটা লেশ থাকতেও পারে।

কুরজ-এ বৈরিতা

মুহম্মদ কাসিম কর্তৃক দাহির নিহত ও আলোর বিজিত হওয়ার পর তাঁর পুত্র জয়সিয়া (জয়সিংহ) ৭০০ পদাতিক সৈন্য ও ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যান কুরজ-এ। সেখানকার

অধিপতি দারোহর রাই তখন ষান্মাষিক ছুটি উপভোগ করছিলেন তাঁর হারেমে। সেখানে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে জয়সিয়া'র আগমনবার্তা পেয়ে তিনি হারেমেই অভ্যর্থনা জানান তাঁকে। সেখানে অজস্র সুন্দরী রমণী দেখে জয়সিয়া চোখ নামিয়ে রাখেন মাটিতে, কোনও রমণীর দিকে চোখ তুলে তাকান না। দারোহর বলেন, এই রমণীদের মা ও বোন হিসেবে বিবেচনা করে তাদের দিকে স্বাধীনভাবে তাকাতে পারেন। জয়সিয়া বলেন, 'মূলত আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, কাজেই কখনও কোনও অপরিচিত নারীর দিকে তাকাই নি।' দারোহর তখন আর তাঁকে বিরক্ত না করে, তাঁর বিনয়ের প্রশংসা করে, নিশ্চিন্তে বসবাসের অনুমতি দেন তাঁকে।

হারেমে সমবেত রমণীদের মধ্যে একজন ছিলেন দারোহরের বোন জানকী। তিনি ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। রাজসভার কবিরা নানা উপমা দিয়ে তাঁর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করে গেছেন। সুদর্শন জয়সিয়াকে দেখে তাঁর প্রেমে পড়েন তিনি, নানা রকম ইঙ্গিতের মাধ্যমে সেই প্রেম তিনি প্রকাশ করতে থাকেন।

জয়সিয়া চলে যাওয়ার পর ঘরে ফিরে জানকী প্রচুর মদ পান করেন, তারপর জয়সিয়ার ঘরে ঢুকে দেখেন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু মদের উগ্র গন্ধে ঘুম ভেঙে যায় জয়সিয়ার। সবিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "রাজকুমারী! এত রাতে আপনি এখানে কেন?" জানকী বলেন, "মূর্খ! এই প্রশ্ন আবার করতে হয়? আমার মতো সুন্দরী একজন নারী বিশেষ একটি উদ্দেশ্য ছাড়া কি এত গভীর রাতে এখানে আসে? আমার রূপ, যৌবন ও কামুকতা দিয়ে কত-শত পুরুষকে আমি উপভোগ করেছি, কত রাজপুত্রকে কামনায় অধীর করেছি, আমার বাসনা ও উদ্দেশ্য কি, তা তুমি ভাল করেই জানো। এ কি লুকিয়ে রাখার মতো কোনও ব্যাপার? চল, সকাল পর্যন্ত এই রাতটি উপভোগ করি আমরা দু'জনে!" জয়সিয়া বলেন, "রাজকুমারী, আমি আমার বৈধ স্ত্রী ছাড়া আর কোনও নারী সঙ্গে সহবাস করতে পারি না। আমার মতো একজন ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এমন ঘৃণিত কাজ করা কখনও সম্ভব নয়। এ কাজকে কোনও জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। এই অপরাধে আমাকে জড়িত করার প্রচেষ্টা থেকে আপনি বিরত থাকুন।" এরপর জানকী অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, কিন্তু তাঁর প্রমত্ত বাসনা চরিতার্থ করতে অস্বীকৃতি জানান জয়সিয়া। হতাশ ও ক্রুদ্ধ হয়ে জানকী চলে যান, মনে-মনে সিদ্ধান্ত নেন এই অপমানের প্রতিশোধ তিনি অবশ্যই নেবেন একদিন।

কাশ্মিরের অন্তঃপুরে

ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই কাশ্মির ছিল লাম্পট্যের এক লীলাভূমি। কর্কট বংশীয় রাজা বলাদিত্য কন্যা অনঙ্গলেখার স্বামী দুর্লভ বর্ধণকে 'অশ্ব-ঘষ কায়স্থ' পদে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজকীয় আস্তাবলের ঘোড়াদের খাবার-দাবার দেখাশোনা করতেন তিনি। খক্ষ নামের এক মন্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন অনঙ্গলেখা। স্ত্রীর ব্যভিচার একদিন স্বচক্ষে দেখতে পান দুর্লভ বর্ধন। হঠাৎ করে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করে

অনঙ্গলেখা ও খঙ্খকে দেখতে পান সংগমরত অবস্থায়। কিন্তু কিছু না বলে খঙ্খ'র পোশাকে তিনি স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে একটি চিরকূট রেখে যান : "মনে রেখো, তোমাকে হত্যা করলাম না—যদিও হত্যার অধিকার আমার ছিল।" সতর্কবাণীটি পড়ে অনঙ্গলেখাকে ত্যাগ করে খঙ্খ চলে যান সঙ্গে-সঙ্গে। বলাদিত্যের মৃত্যুর পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুর্লভকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন তিনি। তবে দুর্লভ নিজেও ব্যভিচারমুক্ত ছিলেন না। একবার এক বণিকের গৃহে আপ্যায়িত হতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে বণিক-পত্নী নরেন্দ্রপ্রভা'র 'পীনোন্নত পয়োধর ও সুগঠিত উরু (সদুর্ভ)' দেখে মোহিত হয়ে পড়েন। ক্রমে তার মাঝে তীব্র কামভাব জাগে। বণিক ব্যাপারটি বুঝতে পেরে স্বীয় পত্নীকে উপহার হিসেবে পাঠান দুর্লভের শয্যাকক্ষে। দুর্লভ তখন "ইতস্তত করে সেই সুন্দরীতমাকে গ্রহণ করেন।

কাশ্মিরি হারেমে এভাবে লাম্পট্য চলে এসেছে যুগের পর যুগ ধরে। ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়-এর তৃতীয় উত্তরাধিকারী বজ্রাদিত্য (বাপ্পায়িক)-এর বিশাল হারেমে ছিল অজস্র সুন্দরী রমণী—"যাদের সঙ্গে তিনি পালাক্রমে উপর্যুপরি সহবাসে রত হতেন ঘোটকীদের সঙ্গে ঘোটকের ন্যায়।" এর মূল্য তাকে দিতে হয়েছে। মাত্র সাত বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যু বরণ করেন দৈহিক ক্ষয়ের শিকার হয়ে। তাঁর উত্তরাধিকারী জয়াপীড় ছিলেন একই স্বভাব-চরিত্রের। পৌণ্ড্রবর্ধন-এর দিকে অভিযানকালে কার্ত্তিকেয় মন্দিরের নর্তকী কমলার প্রেমে তিনি মজেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ললিতাপীড় ছিলেন চরম অসংযমী। ব্যভিচারে মত্ত থেকে তিনি রাজকার্যে অনুপস্থিত থাকতেন। ফলে তাঁর রাজ্য লুটেপুটে খায় পতিতা, কোটন্না ও চাটুকারের দল।

পিতা জয়াপীড় অবৈধ উপায়ে যত সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন তার সবই হাতছাড়া হয়ে যায় ললিতাপীড়ের। পতিতাদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে কোটনা-জাতীয় পরজীবীরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল তাঁর হারেমে। তাঁকে পতিতামগ্ন করে তারা সেই সম্পদ আত্মসাৎ করে। সর্বাঙ্গে মণি-মুক্তাখচিত অলঙ্কার পরে অন্তঃপুরে ঘুরে বেড়াতেন ললিতাপীড়, তবে তাঁর বুকে শোভা পেতো হারেম-রমণীদের নখের আঁচড়। আদিরসাত্মক কৌতুক-কাহিনী বর্ণনায় দক্ষ ব্যক্তিদের তিনি গ্রহণ করতেন বন্ধু হিসেবে, আর সাহসী যোদ্ধা ও পণ্ডিতদের দেখতেন করুণার দৃষ্টিতে। "উদগ্র কামলালসায় আচ্ছন্ন" ললিতাপীড় অল্পসংখ্যক রমণীতে তৃপ্ত হতেন না ; পিতা জয়াপীড়কে তিনি ক্লীব মনে করতেন, কারণ এক স্ত্রী-রাজ্য দখল করার পরও তা ছেড়ে এসেছিলেন তিনি।

হারেমে পতিতাদের নিয়ে আনন্দ-সম্ভোগে মত্ত থাকাতেই ছিল ললিতাপীড়-এর একমাত্র সুখ ; সমমনা ইতর লোকজনের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ; পূর্বপুরুষ ও তাঁদের বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হাসিঠাট্টা করা ছিল তাদের আসরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পরজীবীরা অশ্লীল কটূক্তি দ্বারা সজ্জন বৃদ্ধদের আহত করতো ; ফলে তাঁরা এড়িয়ে চলতেন তাদের। এভাবে জ্ঞানী মন্ত্রী-অমাত্যদের দূরে সরিয়ে তারা হয়ে উঠেছিল ললিতাপীড়ের পারিষদ, নানারকম শঠতা করে তাঁর কাছ থেকে তারা উপহার হিসেবে নিতো অজস্র ধন-সম্পদ। প্রকাশ্য রাজসভায় তিনি বসতেন পতিতা ও বিদূষক

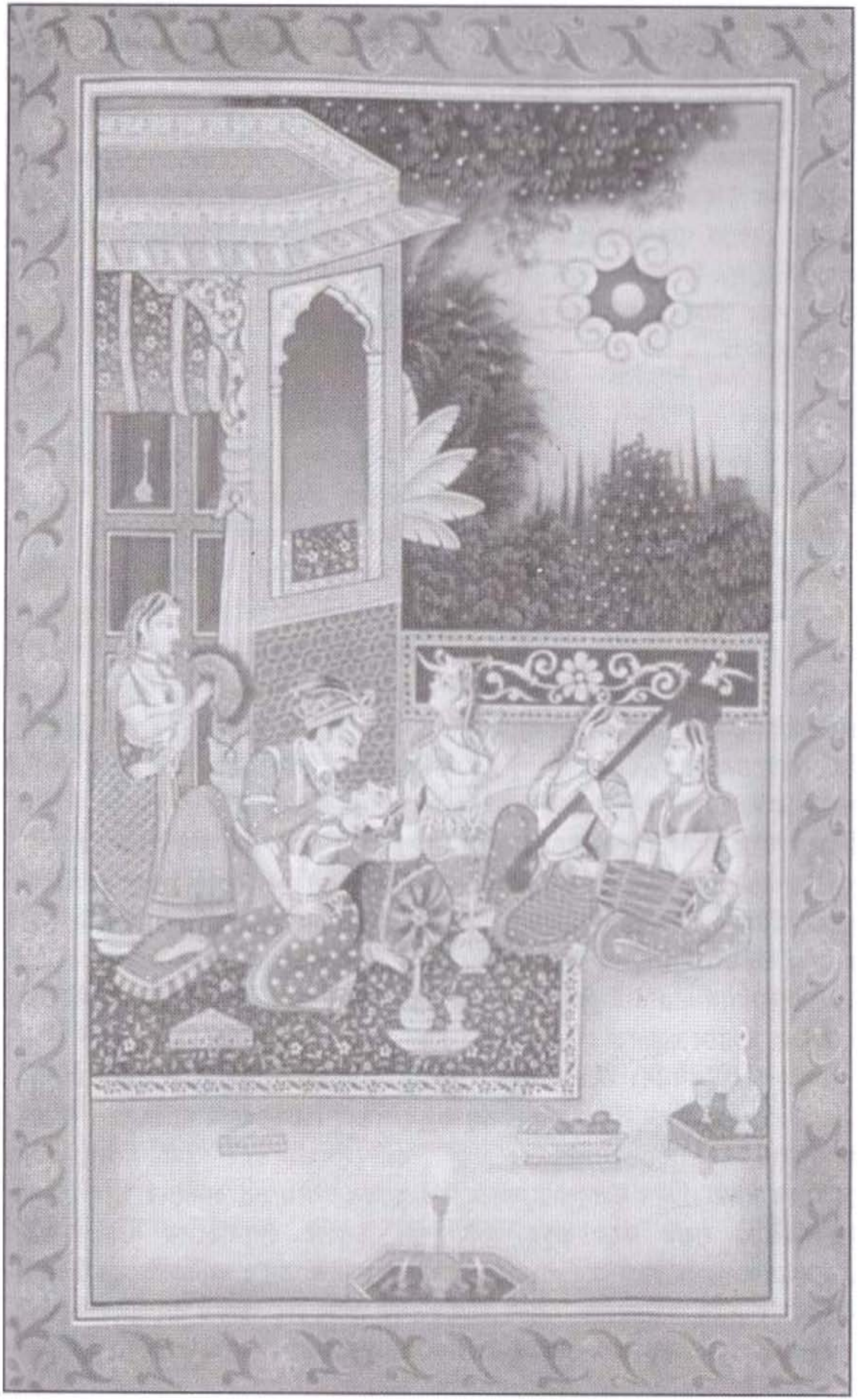

হারেম রমণী পরিবেষ্টিত সম্রাট। সঙ্গীতও আছে যৌনতাও আছে। শিল্পীর চোখে।

বেষ্টিত হয়ে, আর ধূর্ত দোকানিদের মতো কটুভাষায় অপমান করতেন বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রী-অমাত্যদের। তাঁর নষ্টামি এত বেড়ে গিয়েছিল যে, শ্রদ্ধাস্পদ অমাত্যদের তিনি পতিতাদের পদচিহ্ন-শোভিত বিচিত্র পোশাক পরে সভাগৃহে আসতে বাধ্য করেছিলেন। বস্তুত "কামলালসার কুমীর তাঁর সর্বাঙ্গ গ্রাস করেছিল"। রক্ষিতাদের মধ্যে মদ চোলাইকর উপ্প'র কন্যা জয়াদেবীর প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল ললিতাপীড়ের। তার সুগঠিত দেহকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগের জন্য তাকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন হারেমে। জয়াদেবীর পুত্র চিপ্পত জয়াপীড় (বৃহস্পতি) ও তার ভগ্নীপতিরা প্রথমে রাজকোষ লুণ্ঠন করে, পরে রাজক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে জাদুবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করে ললিতাপীড়কে।

উৎপল বংশ

শঙ্করবর্মণ (৮৮৩-৯০২)-এর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী সুগন্ধা প্রেমে পড়েন মন্ত্রী প্রভাকরদেব-এর। তবে তাঁর প্রণয়ী ছিল আরও কয়েকজন, যারা এই সুযোগে রাজকোষের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করতে থাকে। প্রভাকরদেবের কাম-তীব্রতা সুগন্ধাকে সন্তুষ্ট করে, ফলে তিনি হয়ে ওঠেন তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র। এরপর নিজের ভাগ্য, ক্ষমতা ও প্রেম তাঁকেই দান করেন তিনি। রাজকোষের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে ওঠেন প্রভাকরদেব। প্রতিদিনই বিভিন্ন কর্মকর্তাকে অপমান করতে থাকেন তিনি। যতক্ষণ প্রভাকরদেব প্রাসাদে থাকতেন ততক্ষণ কারও প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। হারেমে তাঁর দুষ্কর্মের পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াক তা তিনি চাইতেন না। শঙ্করবর্মণের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গোপালবর্মণ যখন এই অর্থ ও সম্মান অপহরণকারীর ব্যাপারে সচেতন হন, তখন রাজকোষের হিসাব নেন তিনি নিজে। অনেক মূল্যবান সম্পদের খোঁজ না পাওয়ায় তিনি এর কারণ জানতে চান। দুর্বৃত্ত প্রভাকরদেব তখন ধূর্ততার সঙ্গে জবাব দেন—যে-সব সম্পদের হিসাব নেই তা শাহি অভিযানকালে ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু গোপালবর্মণ-এর মনঃপূত হয় না এই জবাব। এতে প্রভাকরদেব খুব ভয় পেয়ে যান। তিনি তখন শরণাপন্ন হন তাঁর এক আত্মীয় রামদাস-এর। জাদুকর হিসেবে খ্যাতিমান রামদাসকে তিনি বলেন ডাকিনীবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে রাজাকে হত্যা করতে। এর দু'বছর পর মারা যান তিনি।

পঙ্গু (নির্জীতবর্মণ) উত্তরাধিকারী মনোনীত হতে পারেন নি, তবে তাঁর পুত্র পার্থ (৯০৬-২১) সিংহাসনে বসেছিলেন। পঙ্গু'র দুই পত্নীই ছিলেন চরম ব্যভিচারী। তাঁদের কামলীলার সঙ্গী ছিলেন পার্থ-এর তরুণ মন্ত্রী সুগন্ধাদিত্য। "ঘোটকীদের মধ্যে ঘোটকের ন্যায়" তিনি উপর্যুপরি সঙ্গমে রত হতেন কামাতুর রানীদের সঙ্গে। রানী বপ্পকদেবীকে সন্তুষ্ট করে প্রচুর অর্থ-সম্পদ উপহার পেয়েছিলেন তিনি। মন্ত্রী মেরুবর্ধণের পুত্ররা রাজানুগ্রহ পাওয়ার আশায় 'সুগঠিত তনু'র অধিকারী সুন্দরী ভগ্নি মৃগাবতীকে বিয়ে দিয়েছিলেন পঙ্গু-র সঙ্গে। সেই মৃগাবতীও আকৃষ্ট হন সুগন্ধাদিত্যের প্রতি। তারপর "কামতপ্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মতো তাঁরা একে অন্যের সঙ্গমসুখ

উপভোগ করেন।" সুগন্ধাদিত্য প্রতিদিনই পালাক্রমে দুই রানীর যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করেন—"গরিব গৃহস্থের একটি মাত্র পাত্রে যেমন দুই স্ত্রী পালা করে খাদ্য গ্রহণ করে"। দুই রানী মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল। যৌনসঙ্গ দানের পারিশ্রমিক হিসেবে দামি-দামি উপহার দিয়ে তাঁরা আসলে চাইতেন নিজ-নিজ পুত্রকে সিংহাসনে বসানোর নিশ্চয়তা। পঙ্গু'র পত্নীদের এই উৎকট ব্যভিচারের কাহিনী অন্তত দুই শতাব্দী পরেও স্মরণ করা হয়েছে জয়সিংহ (১১২৮-৪৯)-এর রাজত্বকালে।

দশম শতক

শ্রীনগর-অধিপতি চক্রবর্মণের পুত্র উন্মত্তবন্তী ছিলেন খল প্রকৃতির, নীতিরীতির কোনও বালাই ছিল না তাঁর। অন্তঃপুরে চরম নারকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। দুর্বৃত্ত সঙ্গীদের প্ররোচনায় রমণীদের নগ্ন করে নানাভাবে নিপীড়ন করতেন উন্মত্তবন্তী। কখনও বাৎস্যায়ন-প্রথায় তাদের আঘাত করতেন অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে, কখনও তাদের দুই স্তনের মধ্যবর্তী স্থানে ছুরি চালাচলি করতেন। আসলে তাঁর উন্মাদনার কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জরায়ু বিদীর্ণ করে তিনি গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থা দেখতেন, শ্রমিকদের দেহে করাত চালিয়ে তাদের সহ্যশক্তি পরীক্ষা করতেন। এইসব জঘন্য অপরাধের জন্য শেষ পর্যন্ত ঘোরতর শাস্তি বরণ করে নিতে হয় তাঁকে। দেহক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হয়ে যখন তিনি দুঃসহ যন্ত্রণায় চিৎকার করতেন তখন শুধু তাঁর প্রজারা নয়, হারেমে তাঁর ১৪ জন নারীও ফেটে পড়তেন আনন্দে।

শঙ্কররবর্মণ-এর রানী সুগন্ধাবতীর গোপন প্রণয়ী প্রভাকরদেব-এর পুত্র যশস্কর সিংহাসনে বসেন ৯৩৯ অব্দে। এক সভাসুন্দরীর খপ্পরে পড়ে তিনি খুব শিগগিরই প্রমাণ করেন যে, এক জঘন্য প্রকৃতির পিতার উপযুক্ত পুত্র বটে তিনি। লল্ল নামের সেই সভাসুন্দরীকে 'প্রেমবশত' হারেমের সকল রমণীর ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করেছিলেন যশস্কর। তার কথায় তিনি উঠতেন ও বসতেন। কিন্তু রাজার এত আনুকূল্য পাওয়া সত্ত্বেও ওই নীচকুলোদ্ভব নারী গোপনে রাত কাটাতেন এক চণ্ডাল প্রহরীর সঙ্গে। ঘটনাটি সম্পর্কে জেনে এবং খোঁজ-খবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে যশস্কর ক্রুদ্ধ হন যথেষ্ট, কিন্তু লল্ল-কে হত্যা করেন না এ কারণে। বরং তাকে অনুগত ও বশীভূত করার জন্য কালো হরিণের চামড়া পরে নানা রকম মন্ত্র-সাধনায় ব্যাপৃত হন।

যশস্করের তৃতীয় উত্তরাধিকারী পর্বগুপ্ত (৯৪৯-৫০) সিংহাসনে বসেছিলেন চক্রান্ত করে। যশস্করের অন্তঃপুরের এক 'শুদ্ধমতি' রানীকে পাওয়ার বাসনা হয়েছিল তাঁর। সেই রানী শর্ত দেন : তাঁর বিষ্ণু মন্দির (যশস্করস্বামীম্)-এর নির্মাণকাজ শেষ হলে রাজার মনোবাসনা তিনি পূর্ণ করবেন। এটি ছিল এক 'পবিত্র প্রতারণা'। কারণ মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে মন্দিরের কাজ শেষ করামাত্র রানী 'পূর্ণাহুতি' (অগ্নিতে আত্মবিসর্জন) করেন।

পর্বগুপ্তের পুত্র ক্ষেমগুপ্ত (৯৫০-৫৮) ছিলের ভারতের সর্বাধিক ব্যভিচারী রাজাদের একজন। প্রথম যৌবনকাল থেকেই জুয়া, মদ ও নারী (বিশেষ করে পরস্ত্রী ও পতিতা)

নিয়ে মত্ত ছিলেন তিনি। মেয়েরা উরু দেখিয়েই তার আনুকূল্য অর্জন করতো। আর পরজীবী ব্যক্তিরা তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীদের বুক ও কোমর অনাবৃত করে দেখাতো, বলতো : "নিরুদ্বেগে প্রেম-আনন্দ উপভোগ করুন! এই রমণীদের বিশেষত্ব যে কি তা মাত্র একবার পরীক্ষা করেই দেখুন!" চরম লাম্পট্যে মগ্ন ক্ষেমগুপ্ত শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেন নির্দয় স্বভাবের কুলটা দিদ্দা-কে। আর দিদ্দা তাঁকে এতই বশীভূত করে যে প্রজারা তাঁর নাম দেয় দিদ্দা ক্ষেম।

দিদ্দা ছিল খোঁড়া। বল্‌গা নামের এক দাসীর পিঠে চড়ে সে ঘুরে বেড়াতো। তবে তার রূপ-যৌবন ছিল অসাধারণ। প্রবল কাম-লালসার কারণে সে স্বামীর প্রতি ছিল অবিশ্বাসী এবং বহুপুরুষভোগী। দিদ্দা শ'-শ' অশোভন ও অসংগত আচরণ করেছিল প্রকাশ্যে। ফটক-প্রহরীদের প্রধান কর্দম রাজ সহ অনেকে পুরুষ সংগ্রহ করে দিতো তার জন্য। ফাল্গুন ও তুঙ্গ নামের দুই ব্যক্তির সঙ্গে প্রায় নিয়মিত কামলীলায় মত্ত হতো দিদ্দা। তুঙ্গ ছিল একজন পত্রবাহক (লেখাহরক), তাকে প্রধান মন্ত্রণাদাতা বানিয়েছিল সে। এরা সকলেই তার অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থেকে ক্ষেমগুপ্তের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করে।

দিদ্দা'র উত্তরাধিকারী সংগ্রাম (১০০৩-২৮) রাজ্যের দায়-দায়িত্ব দুর্বৃত্ত তুঙ্গ'র ওপর ছেড়ে দিয়ে মত্ত ছিলেন ভোগবিলাসে। তাঁর পুত্র কন্দর্পসিংহের পত্নী ক্ষেমা ছিলেন 'সর্বাধিক অসতী'! গোপনে তিনি মিলিত হতেন তুঙ্গ'র ভাই নেগ'র সঙ্গে। নেগ ছিল একজন 'খাস' জাতিবিশেষ।

মম্ম নামের এক রক্ষিতার ঔরসে কন্দর্পসিংহের দুই পুত্রের জন্ম হয়েছিল। নির্বোধ প্রকৃতির রাজা সংগ্রামরাজ-কে নিয়োগ করা হয়েছিল 'নগরাধিকৃত' (নগর-প্রশাসক)। তাঁর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃবধূর অবৈধ সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। তুঙ্গ'র প্রভাবে চন্দ্রমুখ নামের এক যুবককে তাঁর প্রধান মন্ত্রণাদাতা নিয়োগ করেছিলেন তিনি। দেবমুখ নামের এক করণিকের পুত্র চন্দ্রমুখ-এর মা ছিল এক ভ্রষ্টা নারী, পিঠা বিক্রয় ছিল তার পেশা। সংগ্রাম-এর রানী শ্রীলেখা স্বামী-কে যৌনঅক্ষম দেখে বাছবিচারহীন ব্যভিচারে মত্ত হন · অসংখ্য কামসঙ্গী ছিল তার। তুঙ্গ'র ভাই ব্যড্ডসুহ-এর পুত্র ত্রিভুবন প্রায় নিয়মিত মিলিত হতেন তাঁর সঙ্গে। শ্রীলেখার অপর প্রণয়ী জয়াকর সম্পর্কে বলা হয়েছে : "তিনি চুমু খেতেন তার ঠোঁটে, আর লুট করতেন তার স্বামীর সম্পদ।"

হারেমে এ ধরনের ব্যভিচার অব্যাহত ছিল একাদশ শতকেও। রাজা অনন্তের শাসনকালে (১০২৮-৬৩) তার প্রধান মন্ত্রী হলধর (সর্বাধিকারী) ঘন-ঘন রানীর সান্নিধ্যে যেতেন বলে বিশেষ অপবাদের শিকার হয়েছিলেন। পরে আশাচন্দ্র ও অন্যরা বন্দি করেছিল তাঁকে।

অনন্তের পুত্র কলষ (১০৬৩-৮৯)-এর প্রকৃত জনক কে—তা নিয়ে জনমনে নানা সন্দেহ ছিল। "অন্যের স্ত্রীর প্রতি কাম-লালসা তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, রাজার ভগ্নি কল্লনা ও তার কন্যা নগা'র সঙ্গে পর্যন্ত তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। সকলপ্রকার

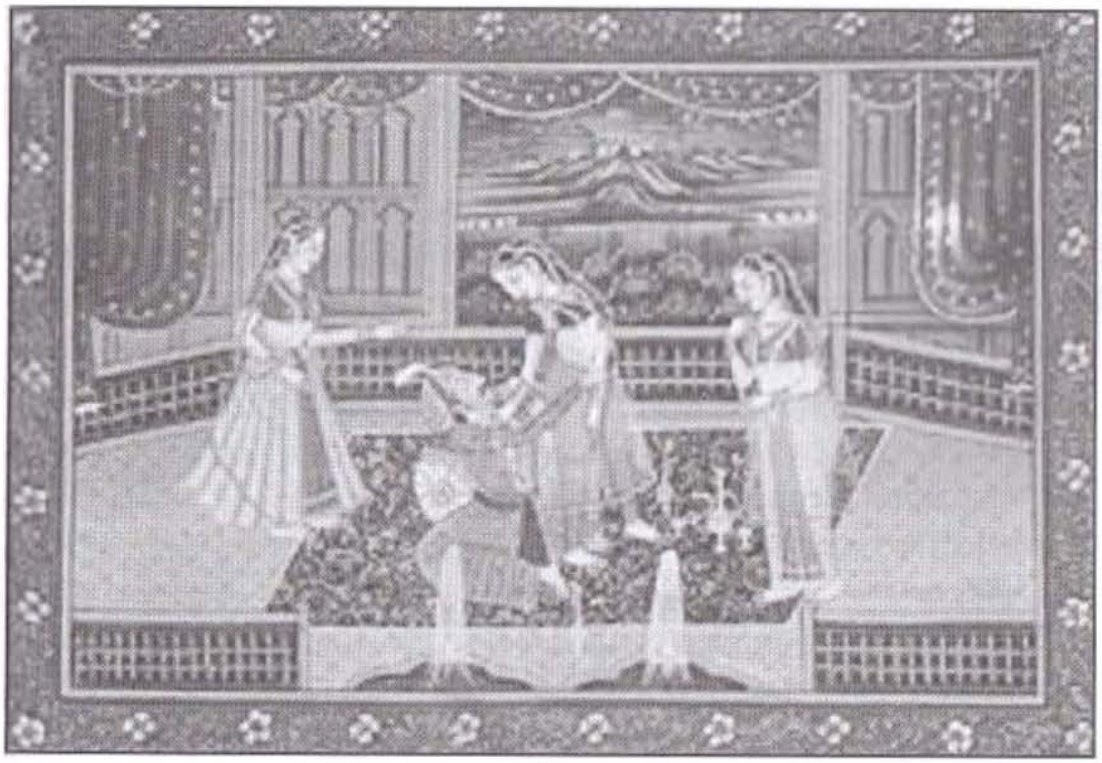

সম্রাট ব্যাকুল। শিল্পীর চোখে।

নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে কলষ প্রতি রাতে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন অবৈধ সম্ভোগের আশায়। নিজের পত্নীদের সান্নিধ্যে কোন সুখ পেতেন না তিনি। তাই সান্ত্বনা খুঁজতেন মন্ত্রী জিন্দুরাজা'র 'অতি ব্যভিচারী' পুত্রবধূর মতো কোনও পরনারীর উষ্ণ আলিঙ্গনে।

এক রাতে সেই রমণীর গৃহে প্রবেশের সময় চণ্ডাল প্রহরীদের দ্বারা আক্রান্ত হন কলষ। কিন্তু যথাসময়ে তাঁর অনুগামীরা হস্তক্ষেপ করায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান তিনি।

কলষের নৈতিকতা-বিরোধী কার্যকলাপের ব্যাখ্যা করে প্রাচীন বিবরণীতে বলা হয়েছে, তিনি আসলে প্রশস্ত নামের এক 'মহত্তম'-এর সন্তান। নিজের সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁর মা তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন আবারও সন্তানবতী হওয়ার আশায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে।

অতিকামুক কলষ-এর জন্য তুর্কিস্থান ও অন্যান্য দূরবর্তী অঞ্চল থেকে সুন্দরী মেয়েদের সংগ্রহ করে আনতো বলীয় নামের এক 'টক্ক' জাতিবিশেষ। অন্যের স্ত্রীদেরও প্রলুব্ধ করে আনা হতো প্রায়ই। এভাবে তার হারেমে সুন্দরী রমণীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭২।

নাচ ও গানের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল কলষ-এর। কাশ্মিরে তিনিই প্রথম ঐকতান (উপাঙ্গ-গীত) ও বিশেষভাবে নির্বাচিত নর্তকীদের অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয় করে তোলেন। মাত্রাতিরিক্ত কামুকতার ফলে মারাত্মক দেহক্ষয় ঘটে তাঁর। শেষ পর্যন্ত

এতেই মৃত্যুবরণ করতে হয় তাঁকে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি উচ্চনীচ অনেককে উপহার-সামগ্রী বিলিয়েছেন, কিন্তু 'তীব্র বিদ্বেষবশত' কিছুই দেন নি স্ত্রীদের। তবে হারেমের যে রক্ষিতাকে তিনি প্রধান মহিষী করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সে হয়েছিল এক গ্রামীণ কর্মকর্তার রক্ষিতা।

কলষ-এর উত্তরাধিকারী উৎকর্ষ-এর এক রক্ষিতা ছিল সহজা নামে। তাঁর সংসর্গে থেকে তিনি আত্মহত্যা করেন ১০৮৯ অব্দে। সহজা পরে এক মন্দিরে কাজ নেয় নর্তকী হিসেবে। সেখানে তার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে উৎকর্ষ'র পুত্র হর্ষ (১০৮৯-১১০১) তাকে রক্ষিতা হিসেবে নিয়ে আসে রাজকীয় হারেমে। সহজা সেখানে তাঁর "প্রেমকে করে তোলে উজ্জ্বল দীপ্তিময়"।

হর্ষ-এর প্রেম-উন্মাদনার নানা কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে প্রাচীন বিবরণীতে। কর্ণাটকের অধিপতি পরমন্দী'র সুন্দরী স্ত্রী চণ্ডলা'র প্রতিকৃতি দেখে একেবারে অধীর হয়ে যান তিনি। কিন্তু শারীরিকভাবে তাঁকে পাওয়ার কোনও উপায় নেই, তাই তাঁর এক মূর্তি গড়ে তিনি তা স্থাপন করেন হারেমে। ওই মূর্তির সেবার জন্য একজন কর্মচারীও নিয়োগ করা হয়।

ধূর্ত পরজীবীরা দেশ-দেশান্তর থেকে ক্রীতদাসী এনে হাজির করতো হর্ষ-এর সামনে, বলতো—এরা দেবী। হর্ষ তখন পূজা করতেন তাদের আর লোকজন মেতে থাকতো হাসিঠাট্টায়। ওই ক্রীতদাসীরা নানারকম পরামর্শ দিতো তাঁকে, বলতো—এগুলো দেবতাদের বাণী। এতে খুব বিভ্রান্ত হতেন হর্ষ। ওই ক্রীতদাসীদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে সংগমে মিলিত হতে চাইতো। কিন্তু তিনি অনেক দ্বিধা নিয়ে সামান্য স্পর্শ করতেন তাদের। তিনি যখন অমরত্ব প্রার্থনা করতেন তাদের কাছে, তখন তারা তাঁকে শ'-শ' বছরের আয়ু দান করতো ! কয়েকজন পরজীবীর চক্রান্ত উদঘাটিত হওয়ার পর হর্ষ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে হারেমের কয়েকজন রমণীকে তাদের প্রণয়ীদের সহ হত্যা করেন, কয়েকজনকে বহিষ্কার করেন হারেম থেকে। বহিষ্কৃতরা অবশ্য খুশি মনেই চলে যায় গোপন প্রণয়ীদের সঙ্গে

অজাচারেও লিপ্ত হয়েছিলেন হর্ষ। বিমাতাদের চুম্বন করে ও তাদের সঙ্গে ক্রমাগত আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে ন্যায়-নীতির সকল সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন তিনি। নিজের বোনদের সঙ্গেও তিনি স্থাপন করেছিলেন অবৈধ সম্পর্ক। কোনও এক কথায় উত্তেজিত হয়ে তিনি পিসতুতো বোন নগা-কে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে করেছিলেন তার শ্লীলতাহানিও। তার যৌনবিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে কোনও-কোনও পুত্রবধূকে তিনি বাধ্য করেছিলেন তাঁর সঙ্গে রাত কাটাতে। তুর্কিস্থানি কাপ্তানকে হর্ষ নিয়মিত অর্থ-সম্পদ উপহার দিতেন; কারণ তুর্কি ও অন্যান্য জাতির রমণীদের তিনি সংগ্রহ করতেন তার মাধ্যমে।

উচ্চল

হর্ষের উত্তরাধিকারী উচ্চল। পূর্বসূরির চেয়ে কোনও অংশে কম ছিলেন না তিনিও। এক নর্তকী পরিবারের মহিলা কণশ্রবতী। দত্তক নিয়েছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল এক মেয়েকে।

তার নাম ছিল জয়ন্তী। কুমারীত্ব হারানোর পর সে হয়েছিল উচ্চল-এর রক্ষিতা। পরে লোভের বশে সে হয় প্রদেশপাল আনন্দ-এর রক্ষিতা। আনন্দ-এর মৃত্যু হলে সে আবার আসে উচ্চল (১১০১-'১১)-এর কাছে। উচ্চল তাকে প্রধান মহিষী করেন। এতেও খুশি হয় নি জয়ন্তী। সে সিংহাসনের অর্ধেক দাবি করে বসে। সঙ্গে-সঙ্গে এই দাবি মেটান উচ্চল। বস্তুত জয়ন্তীর প্রতি এত তীব্র আকর্ষণ ছিল তাঁর যে, একদিনের জন্যও তার কাছছাড়া হতে পারতেন না তিনি। শেষ দিকে চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটায় এক ধরনের বিদ্বেষও অনুভব করতেন। ওই বিদ্বেষ পরে স্থায়ী রূপ নেয়। তখন বর্তুল-এর রাজকন্যা বিজ্জলা'র প্রতি আকৃষ্ট হন। একদিন তার গৃহে প্রবেশের সময় কতিপয় চক্রান্তকারী কর্তৃক আক্রান্ত হন তিনি।

অমাত্যদের ওপর প্রভাব

রাজা হর্ষ-এর নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপের প্রভাব থেকে অমাত্যরা মুক্ত ছিল না। মন্ত্রী সদ্দ'র পুত্র চুদ্দ ও অন্য কয়েকজন রাজা সুস্‌সলকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর তারা বসবাস করতো বিধবা মায়ের সঙ্গে। মহিলা ছিলেন অত্যন্ত কামুক প্রকৃতির। মায়্যামত্তক নামের এক প্রণয়ী ছিল তাঁর। সন্দেহবশত এই মায়্যামত্তক-কে হত্যা করে চুদ্দ ও তার সঙ্গীরা।

১১১২ অব্দে সুস্‌সল-এর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন সল্‌হণ। তিনিও নীতিবিগর্হিত জীবনযাপন করেন। কোনও রমণীর সঙ্গে এক রাত কাটানোর পর তিনি পরের রাতের জন্য তাকে পাঠিয়ে দিতেন ভাই লোষ্ঠাণু'র কাছে। এইভাবে দুই ভাই ভাগাভাগি করে নিতেন সিংহাসনের আনন্দ।

রাজা ভিক্ষশ্চর (১১২০-২১) ও তাঁর প্রধান মন্ত্রী (সর্বাধিকারী) বিম্ব (নেপথ্যে ইনিই ছিলেন আসল শাসক) মগ্ন ছিলেন সকল ধরনের অনৈতিকতায়। বিম্ব ছিলেন তাঁর প্রভুর পুরোপুরি বশংবদ, পতিতাদের সঙ্গে প্রমোদমত্ত হয়ে তিনি রাজকার্যে অবহেলা করতেন। প্রতিদিন নতুন রমণীর সঙ্গে রাত কাটানো ছিল তাঁর নেশা। ওদিকে বিম্ব-এর গুরুনিতম্বধারী পত্নীর প্রণয়ী ছিল ভিক্ষশ্চর। স্বামীর সামনেই তিনি রাজার হাতে খাবার খেতেন, রাজার সঙ্গে হেসে-হেসে ঢলাঢলি করতেন, যখন-তখন বক্ষদেশ ও বগল উন্মুক্ত করে দেখাতেন। এইভাবে মন্ত্রীর পত্নীর সঙ্গে প্রমোদলীলায় মগ্ন থেকে রাজকীয় কার্যাদিতে অবহেলা করতেন তিনি ; হারেমে আসর বসিয়ে নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন। বিম্ব রাজ্য ত্যাগ করে বনে যাওয়ার পর তাঁর পত্নীকে তিনি রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি।

তবে ভিক্ষশ্চরের অন্তঃপুরে লম্পটদের আনাগোনা ছিল সবসময়ই। এমন এক ধূর্ত লম্পট ছিলেন কোষ্ঠেশ্বর। ভিক্ষশ্চরের সুন্দরী পত্নীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনায় প্রায় উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ভিক্ষশ্চরের জীবৎকালে কেউই যেতে পারে নি তাঁদের কাছে। তবে কোষ্ঠেশ্বরের সৌন্দর্যমণ্ডিত যুবা কান্তি তরুণীদের আকৃষ্ট করেছে সবসময়েই।

ভিক্ষশ্চরের পুত্র মল্লার্জুন ১১৩১ অব্দে বসেন লোহারা'র সিংহাসনে। অজস্র সভাসুন্দরী, ভাঁড় ও বাজিকর নিয়োগ করে পৈতৃক সম্পত্তি নিঃশেষ করেন তিনি।

উচ্চ-বংশোদ্ভুত হলেও চিত্রীয় আমৃত্যু কামবিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করে গেছেন।

চিত্ররথ-এর বড় ভাই লোষ্ঠরথ (লোথরথ) প্রাণরক্ষার জন্য পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এক নর্তকীর গৃহে। সেই নর্তকীর নগ্ন স্তনযুগে মুখ গুঁজে নিজেকে লুকাতে চেয়েছিলেন তিনি।

লবন্যাস-এর বিধবা পত্নীরা অর্থলালসায় গ্রামীণ কর্মকর্তা এমন কি সাধারণ গৃহস্থদের সঙ্গেও রাত কাটিয়েছে।

এসবের পাশাপাশি বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে গৃহে স্থান দেয়া নর্তকীদের সঙ্গে অবৈধ সংগমে মিলিত হওয়ার অভিযোগে অনেক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন রাজা জয়সিংহ (১১২৮-৪৯)।

গোর বংশীয় শাসক

সুলতান মালিক মাহমুদ সুরি'র রাজত্বকালে তাঁর রাজধানী গোর আক্রমণ করেন সুলতান আলাউদ্দিন হুসাইন—তিনি গজনির প্রাসাদে মত্ত ছিলেন সুরা ও সাকিদের নিয়ে। প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার পর তিনি মদ ও নারীতে মজে যান পুরোপুরি।

ওই অঞ্চলের অন্য একজন শাসক সুলতান মুইজুদ্দিন (১২০৬-'২৬) মাঝে মধ্যে মত্ত হতেন নানা ধরনের ভোগবিলাসে ; কোনও-কোনও রাতে দাসদাসীদের তিনি দু'হাতে সোনা-রূপা বিলাতেন, কোনও কাজ না পেয়ে সময় নষ্ট করতেন কামলীলায় ও ব্যভিচারে।

সুলতান কুতবুদ্দিনের দুই কন্যার স্বামী নাসিরুদ্দিন কুবাচা ছিলেন অত্যন্ত ভোগবিলাসী, রমণী-সঙ্গ পেতে তিনি পরিচয় দিয়েছেন চরম উচ্ছৃঙ্খলতার।

শামসিয়া বংশীয় শাসকদের মধ্যে রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহ ১২৩৬ অব্দে রাজত্ব করেছেন মাত্র ৬ মাস ২৮ দিন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি, কিন্তু তার যাবতীয় ভোগবিলাসের মূল প্রেরণা ছিল কামুকতা, আমোদ-প্রমোদ ও উচ্ছৃঙ্খলতা। এসবের কারণেই পতন ঘটে ওই সাম্রাজ্যের।

ভারতের মুসলমানগণ কোনও নারীর অধীনতা মেনে নিতে নারাজ ছিল। সুলতান সাইয়িদ শামসুদ্দিনের পর সুলতানা রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করলে অমাত্যরা কিছুকাল ব্যাপারটা সহ্য করে। কিন্তু তিনি যখন জামালুদ্দিন ইয়াকুত-কে অশ্বারোহী-বাহিনীর পরিদর্শক এবং নিজের ব্যক্তিগত অনুচর নিয়োগ করেন, তখন তুর্কি সেনাপতি ও অমাত্যরা বিক্ষুব্ধ হয়। এরপর নারীসুলভ পোশাক ও নেকাব ত্যাগ করে তিনি যখন টুপি পরে প্রকাশ্য জনসমক্ষে উপস্থিত হন হাতির পিঠে চড়ে, তখন তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাঁর অমাত্যরা বিদ্রোহ করে, আর তুর্কিরা আক্রমণ চালায়। ইয়াকুত নিহত হন। সুলতানা রাজিয়াকে প্রথমে বন্দি, পরে হত্যা করা হয়।

রুকনুদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন মাসুদ শাহ্ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মত্ত হয়েছিলেন চরম ভোগবিলাসে। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এ কারণে। চার বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

খিলজী বংশ

বলবনের পুত্র কায়কোবাদ সিংহাসনে বসেন ১২৮৬ অব্দে। শিক্ষকদের কড়া অনুশাসনে বড় হয়ে উঠলেও এক পর্যায়ে চরম ভোগবিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত হন তিনি। লালমহল ত্যাগ করে তিনি বসবাস করতে থাকেন যমুনা-তীরবর্তী কিলু-গারহি'র মনোরম প্রাসাদে । সেখানে দিনরাত চলতে থাকে সব ধরনের আমোদ-প্রমোদ। পিতার নির্দেশে কিছুকাল সংযম পালন করলেও লখনউ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথে এক নর্তকীকে দেখে সকল প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হন তিনি, আবারও শুরু করেন পুরনো কেতায় ভোগলীলা। পরে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন, হারেমে তাঁর অবস্থান হয় বিড়ম্বনাকর।

মাণ্ডু

৩২ বছর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ৪৮ বছর বয়সে সুলতান গিয়াসউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিজেকে তিনি ভোগবিলাসের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন বিশেষভাবে। তাঁর ছিল ১৫,০০০ রমণীবিশিষ্ট এক হারেম। কোনও সুন্দরী রমণীর কথা তার কানে এলে তাকে না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হতেন না তিনি। চমৎকার এক উদ্যানে হারেম-রমণী পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি শিকারে মত্ত থাকতেন। রাজত্বের ৩২ বছর তিনি ব্যয় করেছেন একটানা সম্ভোগলীলায়।

আলাউদ্দিন খিলজি (১২৭৬-১৩১৭)-র শাসনকালে যখন নও মুসলিম অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুগলরা, বিদ্রোহ করে তখন প্রথমেই তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের কারারুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। ঐতিহাসিক বারনির মতে, এভাবেই শুরু হয় পুরুষের অপরাধে নারী ও শিশুদের শাস্তিদান। যখন তার ভাইকে হত্যা করা হয় তখন খিলজি প্রথমে হত্যাকারীদের স্ত্রীদের অমর্যাদা করার এবং পরে তাদের দুশ্চরিত্র লোকদের হাতে তুলে দিয়ে পতিতা বানানোর আদেশ দেন। রাজপুত্র সরদার পূরণ মল-এর স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে শের শাই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বারনি বলেছেন, আলাউদ্দিন মায়েদের মাথার ওপর তাদের সন্তানদের রেখে টুকরা টুকরা করে কাটার নির্দেশ দিতেন, "যা কখনও কোনও ধর্মে বা সম্প্রদায়ে ঘটে নি"।

মুগলরা পরাজিত হওয়ার পর তাদের পরিবারের নারী ও শিশুদের দিল্লির বাজারে বিক্রি করা হতো দাস হিসেবে। যখন তারা বিদ্রোহ করতো, তাদের বাড়িঘর লুট করা হতো, আর তাদের স্ত্রীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হতো। আলাউদ্দিনের ছেলেরাও নিজেদের সংযত না করে আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তবে অজস্র অন্যায়ের প্রতীক আলাউদ্দিন নিজে শোথ-রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ধুঁকতে ধুঁকতে।

তাঁর পুত্র কুতুবউদ্দিন খিলজি (১৩১৭-২০) "খোলাখুলি, সবার সামনে যৌনতায় লিপ্ত হতেন এবং জনগণ অনুসরণ করতো তাঁর দৃষ্টান্ত।" সুদর্শন কিশোর, খোজা এবং সুন্দরী তরুণী-কিশোরীদের দাম আলাউদ্দিনের নির্ধারিত ৫০০ থেকে ১০০০ ও ২০০০ তঙ্কা পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। মদ্যপান জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রমোদে মত্ত হতো। চার বছর চার মাসের রাজত্বকালে কুতুবউদ্দিন মাতলামি, গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, উপহার দেয়া-নেয়া এবং নিজের লালসা চরিতার্থ করা ছাড়া কিছুই করেন নি আর। তাঁর সারা জীবন কেটেছে চূড়ান্ত আমোদ-প্রমোদ, ব্যভিচার, নেশা ও নির্লজ্জতার মধ্যে।

তুগলক বংশ

মুহম্মদ তুগলক (১৩২৫-'৫১), যাকে বারনি বলেছেন 'জঘন্য বেশ্যাপুত্র', অসংখ্য নিষ্ঠুরতা সম্পাদনের পর তাঁর প্রাসাদ ও হারেমে নিম্নশ্রেণীর লোকদের সম্মানিত করার পদক্ষেপ নেন। তাদের মধ্যে জিনবন্ধ ও রুকন পিসার থানেসরি'র নাম উল্লেখযোগ্য, যাদের সম্পর্কে বলা হয় 'অসাম্যের নেতা এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বঞ্চিত মানুষ'। বারনিকে তিনি বলেছিলেন, জামশিদ-এর আইন 'পৃথিবীর আদিকালের জন্যই প্রযোজ্য', আর তিনি 'সামান্য অবাধ্যতার জন্য মৃত্যুদণ্ড' দেবেন।

ফিরোজ শাহ তুগলক-এর রাজত্বকালে (১৩৫১-৮৮) তাঁর *খান-ই-জাহান* এবং *দিওয়ান-ই-ওয়াজারা* ছিল একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। তার নাম ছিল কাত্তু তিনি ছিলেন তেলেঙ্গানার অধিবাসী। হারেমের বিনোদনের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল প্রচুর, সুন্দরী দাসীদের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ দুর্বলতা।

জানা যায়, তাঁর হারেমে রুম (এশিয়া মাইনর) ও চীন-এর ২০০০ লোক ছিল। সেখানেই তিনি বেশির ভাগ সময় কাটাতেন দায়িত্বে অবহেলা করে। অভাবনীয় অনাচার সত্ত্বেও তিনি বেঁচেছিলেন ৮০ বছরের বেশি, আর সন্তান রেখে গিয়েছিলেন অনেক।

১৩৮৮ অব্দে শাহজাদা মুহম্মদ তুগলক সমূহ ক্ষতি ও বিপদকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেন হারেমের আমোদ-প্রমোদে। ওই বছর ফিরোজ শাহ তুগলকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফাত্তাহ্ খানের ছেলে গিয়াসউদ্দিন তুগলক মাত্র পাঁচ মাস কয়েক দিনের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই স্বল্প সময়েও তিনি রাজ্য-সংক্রান্ত কর্তব্যে অবহেলা করে, নিজেকে যৌবনের আবেগের কাছে সমর্পণ করে লিপ্ত হন হারেমের অনাচার ও বিলাসিতায়। ফলে সর্বত্র শুরু হয় অত্যাচার আর অনাচার।

দাক্ষিণাত্যের বাহমিনি বংশ

দক্ষিণ দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগুলিতে সীমাহীন গতিতে ব্যভিচার চালু ছিল। ১৩৯৭ সালে গিয়াসউদ্দিন শাহ বাহমিনি, লালনিচিন নামের এক তুর্কি দাস-প্রধানের শিক্ষিত মার্জিত কন্যার প্রতি অনুরক্ত হয়ে অন্ধত্ব ও হত্যার শিকার হন। ১৩৯৬-৯৭ অব্দে

মদ্যপ ফিরোজ শাহ বাহমিনি বিভিন্ন দেশের ৩০০ জন রমণী দিয়ে পূর্ণ করেন তাঁর হারেম। তারপর সেখানেই ব্যয় করেন দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়।

১৩১০ অব্দে মালাবার (করমণ্ডল উপকূল)-এর শাহি মহলে প্রথা ছিল, প্রতিদিনের প্রশাসনিক কাজ শেষ হয়ে গেলে এবং প্রজাদের ভিড় নিষ্ক্রান্ত হলে এক হাজার সভাসুন্দরী সুলতানের মনোরঞ্জন করবে।

শিল্পীর চোখে সম্রাট ও এক হারেম রমণী

পঞ্চদশ শতকেও বাহমিনিদের প্রাসাদ ও হারেমে ব্যভিচার চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। ১৪৬০ অব্দে প্রায়োন্মাদ হুমায়ুন শাহ বাহমিনি (জালিম), রমণীদের বাড়ি-বাড়ি থেকে তুলে এনে নিপীড়ন শুরু করেন। তাঁর প্রিয়পাত্রেরা এতখানি অশালীন হয়ে উঠেছিল যে, ফিরিশতা'র মতো ঐতিহাসিকের পক্ষেও তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজধানীর উন্মুক্ত পথে বিয়ের শোভাযাত্রা থামিয়ে তিনি কনেকে তুলে নিয়ে যেতেন, উপভোগের পর ফিরিয়ে দিতেন আবার।

পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসারী দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ বাহমিনি মুহম্মদ গাওয়ানের কাছ থেকে ১০০ সারকাসিয়ান, জর্জিয়ান ও হাবশি দাস (যাদের বেশির ভাগই সম্ভবত রমণী) পেয়েছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে গিয়াসউদ্দিন শাহ বাহমিনির ঐতিহ্য মেনেই হয়েছিল। তাঁর হারেমের জন্য আরব, সারকাসিয়ান, রাশিয়ান, জর্জিয়ান, ইউরোপীয়, চৈনিক, এবং অন্যান্য জাতির রমণী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন বিশেষভাবে।

ষোড়শ শতক

শের শাহ সুরির উত্তরাধিকারী মুহম্মদ শাহ সুরি-কে ডাকা হতো আদিলি নামে। কারণ নিজেকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ভোগবিলাসে। ন্যূনতম প্রয়োজন হিসেবে যেটুকু লেখাপড়া করা দরকার তার প্রতিও অবহেলা করেছিলেন তিনি। হেমু নামের এক হিন্দু দোকানির ওপর প্রশাসনিক সকল দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করে তিনি দিনরাত মেতে থাকতেন হারেম-সুন্দরীদের নিয়ে। চারপাশে কি ঘটছে, সেদিকে কোনও খেয়াল ছিল না তাঁর। উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে গিয়ে রাজকোষ উন্মুক্ত করে তিনি পদ-মর্যাদা নির্বিশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন সমুদয় ধন-সম্পদ।

ওই সময়ে দুই কুখ্যাত ব্যভিচারী ছিলেন গুজরাতের মাহমুদ বিগারা ও সারঙ্গপুরের বাজ বাহাদুর।

বিগারা ছিলেন বিকৃত যৌনক্রিয়ায় আসক্ত। নিয়মিত আফিম গ্রহণ করতেন তিনি। প্রতি রাতে নতুন রমণীর সঙ্গে মিলিত হওয়া ছিল তাঁর নেশা।

অপর যৌন-উন্মাদ বাজ বাহাদুর মদ ও নারী নিয়ে বর্বরোচিত প্রমোদে মত্ত থাকতেন সবসময়। ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন, সুর ও সংগীতকে এই দুর্বৃত্ত এত গুরুত্ব দিয়েছিল যে, তাঁর সকল মূল্যবান সময় সে ব্যয় করেছে তাতেই। সম্রাট আকবর যখন ওই নির্বোধকে দমন করার জন্য আদহাম খানকে পাঠান, তখন মাতাল ও প্রায়-বিবস্ত্র অবস্থায় তিনি পালিয়ে যান খান্দেশ-এ। আগুয়ান মুগল বাহিনীর সামনে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে তাঁর জীবনের ভূষণ, তাঁর সকল বিনোদনের উৎস গায়িকা ও নর্তকীরা, সুন্দরী-শোভিত হারেম ও সকল ধন-সম্পদ। তাঁর প্রধান সভাসুন্দরী, বিখ্যাত রূপমতী, তাঁর প্রতি এতই নিবেদিত ছিল যে আদহাম খান যখন তাঁকে বন্দি করতে যান তখন সে বিষপানে আত্মহত্যা করে। হারেমের বেশ কয়েকজন সুন্দরী মুগ্ধ করেছিল আদহাম খানকে, এই মুগ্ধতার জন্য পরে কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল তাঁকে।

আকবর

আকবরের হারেম ছিল তাঁর পূর্বসূরিদের হারেমগুলোর মতোই—অলঙ্ঘ্যনীয়, তবে উদারতা দেখিয়ে তিনি মাঝে-মধ্যে ব্যতিক্রমও ঘটাতেন। তাঁর এক অমাত্য শাহ কুলি মহরম-ই-বাহারলু (আমির ও পাঞ্জাবের প্রশাসক) সম্রাটের শুভেচ্ছায় একবার হারেমে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। সেখানে কি ঘটেছিল তা কোনও বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয় নি, তবে জানা যায় : সেখান থেকে তিনি সোজা বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন, তবে তাঁর অণ্ডকোষ কেটে নেয়া হয়েছিল (মজবুব)।

আকবরের অন্য দুই অমাত্যের কথা এখানে বলা যায়—যারা প্রচণ্ড ভোগবিলাসের মধ্যে জীবনযাপন করতেন। আমোদ-প্রমোদ ও লাম্পট্যে সদামত্ত ইসমাইল কুলি খান (খান জাহান-এর ভাই)-এর হারেমে ছিল ১২০০ রমণী। তাঁর ঈর্ষা-সন্দেহ এত প্রবল ছিল যে, দরবারে যাওয়ার সময় তিনি ওই রমণীদের নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাসে সিল মেরে যেতেন। তাদের ওপর তিনি আরও নানাভাবে উৎপীড়ন চালাতেন। অবস্থা চরমে পৌঁছলে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে তারা।

বহুবিবাহের ব্যাপারে খান-ই-আজম মির্জা আজিজ কোকা'র ছিল বিচিত্র ধ্যান-ধারণা। তিনি বলতেন, প্রত্যেক পুরুষের চার জন স্ত্রী থাকা আবশ্যক, একজন ইরানি স্ত্রী কথাবার্তা বলার জন্য, একজন খোরাসানি স্ত্রী গৃহস্থালীর জন্য, একজন হিন্দু স্ত্রী সন্তান পালনের জন্য এবং একজন মাওয়ারান্নাকর স্ত্রী—'অন্য তিনজনকে শাসনে রাখার চাবুক হিসেবে'।

জাহাঙ্গির

প্রেমিক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও জাহাঙ্গির, মানুচ্চি লিখেছেন, "ছিলেন সুখাদ্য, নৃত্য ও গীতবিলাসী—ধর্মাচরণের ব্যাপারে গ্রাহ্যহীন।" অতিমাত্রায় মদ্যপানেও আসক্ত ছিলেন তিনি, রোজা রাখতেন না এবং নিষিদ্ধ শূকরমাংস গ্রহণ করতেন। অন্যের ব্যভিচার সহ্য করতেন না, কিন্তু নিজেকে তা থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। যদি অতিচঞ্চল ও অতিরমণীকাতর কোনও যুবককে দেখতেন তবে শাস্তি হিসেবে তাকে নিম্নবর্ণের কুরূপা দুর্গন্ধযুক্ত রমণীর সঙ্গে কয়েদ করে রাখতেন, সেখানে তার সারা গায়ে ময়লা মাখিয়ে রাখা হতো কয়েকদিন ধরে।

রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে জাহাঙ্গিরের দূরদর্শী চোখ পড়ে নুরজাহানের ওপর। স্বামী নিহত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত নুরজাহান রাজি হন হারেমে বাস করতে। তবে তাঁর শর্ত ছিল : তাঁকে প্রধান মহিষী করতে হবে, তাঁর পিতাকে উজির বানাতে হবে এবং তাঁর সকল ভাই ও আত্মীয়দের দরবারে অমাত্য হিসেবে স্থান দিতে হবে। সকল শর্তে রাজি হয়ে জাহাঙ্গির আট দিন রোজা রাখেন, দরবারে প্রচুর উপহারসামগ্রী বিলান এবং তাঁকে নুরজাহান উপাধিতে ভূষিত করেন। দিনের পর দিন তাঁর প্রভাব, সেই সঙ্গে মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোনও নারীকে জমি বরাদ্দ করা যেতো না। তিনি খেতাবও দান করতে থাকেন, যদিও এর আগে সার্বভৌম প্রতিভূ হিসেবে সম্রাটই শুধু ওই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মাঝে-মধ্যে সম্রাটের বদলে নুরজাহান বসতেন প্রাসাদের শাহি ঝরোকায়, উপস্থিত অমাত্য-পারিষদগণ তাঁর নির্দেশ শুনতেন তখন। মুদ্রায় সম্রাটের নামের সঙ্গে তাঁর নামও খোদিত হয়। তাতে লেখা থাকতো : "বাদশাহ জাহাঙ্গিরের নির্দেশে স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে রানী বেগম নুরজাহানের নামের ছাপ বুকে ধারণ করতে পেরে।"

সকল ফরমানে জাহাঙ্গিরের নামের পাশে নুরজাহানের নাম থাকতো। প্রায়ই জাহাঙ্গির ঘোষণা করতেন তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করেছেন নুরজাহানকে। আর প্রায়ই বলতেন, যখনই কোনও সমস্যা দেখা দেয় তখনই ও সমাধান করে ফেলে সঙ্গে-সঙ্গে। যে কেউ নুরজাহানের আশ্রয় প্রার্থনা করলে অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতো। যদি কোনও এতিম মেয়ের অসহায় অবস্থার কথা তিনি শুনতেন তা হলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে মূল্যবান উপহার-সামগ্রী দিতেন। কথিত আছে, তাঁর আমলে এমন বিয়ে হয়েছিল প্রায় ৫০০টি। মানুচচি লিখেছেন, মুদ্রায় নুরজাহানের নাম ও ১২ রাশির প্রতীক খোদিত হতো। তবে আত্মজীবনীতে জাহাঙ্গির যা লিখেছেন তা মানুচচি'র বিবরণের সঙ্গে মেলে না। জাহাঙ্গির লিখেছেন, ওই ব্যাপারটি তার নিজের উদ্ভাবনা এবং 'ইতিপূর্বে কখনও তা করা হয় নি'।

শাহজাহানের দুই কন্যা

সম্রাট শাহজাহান (শাসনকাল ১৬২৮-৫৮)-এর দুই কন্যা বিখ্যাত হয়ে আছেন ভারতের ইতিহাসে। তাঁদের মধ্যে বড় জাহান আরা (১৬১৪-৮১) হারেমে পরিচিত

ছিলেন 'বেগম সাহেব' নামে। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই শুরু হলে তিনি জোর সমর্থন দেন দারা শুকো (১৬১৫-৫৯)-কে, অন্য দিকে ছোট বোন রোশন আরা (১৬১৭-৭১) পক্ষ নেন আওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭)-এর। দুই বোনেরই প্রণয়ী ও প্রিয়পাত্র ছিল অনেক।

জাহান আরা

মুগল শাহজাদিদের বিয়ে না দেয়ার ব্যাপারে এক নির্দেশ ছিল সম্রাট আকবর (শাসনকাল ১৫৫৬-১৬০৫)-এর, সেই সূত্রে বিয়ের ব্যবস্থা হয় নি জাহান আরা'র। তবে মহলে ও হারেমে উদ্যোগ ছিল এ ব্যাপারে। ভই দারা শুকো (শিকো) প্রায়ই আবেদন জানাতেন শাহজাদাদের কাছে, বলতেন দরবারের মুখ্য সেনাধ্যক্ষ নজাবত খানের সঙ্গে জাহান আরা'র বিয়ে দিতে। নজাবত খান ছিলেন বলখ-এর শাহি বংশের সন্তান। তবে এ বিয়েতে নানা যুক্তি দেখিয়ে ঘোরতর আপত্তি জানাতেন সুচতুর শায়েস্তা খান। তাঁর আশঙ্কা ছিল, এ বিয়ের কারণে নজাবত খানের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে, আর তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তিনি। এর পর জাহান আরা'র বিয়ের আলোচনা বন্ধ থাকে, কেউ আর টুঁ শব্দটি করে না এ ব্যাপারে। এ অবস্থায় গোপন প্রেমাভিসারে লিপ্ত হন তিনি।

একবার শোনা গেল জাহান আরা'র মহলে নিত্য যাতায়াত করে এক প্রেমিক। খোঁজখবর নিয়ে শাহজাহান নিজে যান সেখানে। তখন সেই প্রেমিক তাড়াতাড়ি মহল ছেড়ে বাইরে যেতে না পেরে প্রাণ বাঁচাতে লুকিয়ে পড়ে চুলির উপরে রাখা এক পাত্রে। শাহজাহান টের পেয়ে আগুন ধরিয়ে দেন চুলিতে, তখন সেই পাত্রে জ্যান্ত সেদ্ধ হয়ে মারা যায় জাহান আরা'র হতভাগ্য প্রণয়ী।

এ ঘটনার পর যথেষ্ট সতর্ক হয়ে পড়েন 'বেগম সাহেব', তাহলেও রাতের পর রাত বাড়ে তাঁর শয্যাসঙ্গীর সংখ্যা। ওই শয্যাসঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আদর-যত্ন পায় শক্ত সমর্থ গড়নের এক সুদর্শন তরুণ। সে ছিল হারেমের প্রধান নর্তকী ও গায়িকার পুত্র। জাহান আরা 'শাহজাদা' (ঘরের ছেলে) উপাধি দিয়েছিলেন তাকে। কিন্তু বেশি লাই পেয়ে ঘাড়ে চড়ে বসায় নিজের বিপদ ডেকে আনে সে।

কয়েক বছর ধরে চলে হারেমে উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবন। জাহান আরা মারা যান ১৬৮১ অব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর। রোশন আরা'র মৃত্যুর ১০ বছর পরে। মৃত্যুর আগে তিনি ভাইঝিদের মধ্যে বিলিয়ে যান তাঁর সমুদয় সম্পত্তি ও রত্ন-অলঙ্কার। সবচেয়ে দামি রত্নগুলো এবং সম্পত্তির সবচেয়ে বড় অংশ তিনি দান করেন প্রিয় ভাইজি জানি বেগমকে। তাঁর মৃত্যুর খবর যখন আওরঙ্গজেব-এর কাছে পৌঁছায় তখন তিনি ব্যস্ত দাক্ষিণাত্য অভিযানে। সামনে শত্রু..., তারপরও শোক পালনের জন্য যাত্রাবিরতি করেন তিনি। নির্দেশ দেন তিন দিন ধরে শোক পালনের। বিরোধিতা ছিল, বৈরিতা ছিল, তারপরও জাহান আরা'র মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কখনও কুণ্ঠা করেন নি আওরঙ্গজেব।

রোশন আরা

জাহান আরা'র মতো রোশন আরা'-ও যৌনতৃষ্ণা মেটাতে খুঁজে নিতেন একের পর এক পুরুষসঙ্গী। আওরঙ্গজেবের মুখ্য খোজা একবার তাকে জানায়, দুই তরুণকে আটক করা হয়েছে রোশন আরা'র বাগান থেকে। আসলে শাহজাদির চাহিদা মিটিয়ে তখন গোপনে হারেম ত্যাগ করছিল তারা। সম্রাটের নির্দেশে কষে চাবুক মারা হয় তাদের। পরে একজন যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সেই দরজা দিয়েই পালায়, অন্যজন লাফিয়ে বাগানের পাঁচিল টপকাতে গিয়ে মারা যায় গুরুতর আহত হয়ে।

১৬৭৩ অব্দে বিয়ে হয় অনেক ক'জন শাহজাদির, কিন্তু বিয়ে হয় না রোশন আরা'র। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নয়জন সুদর্শন সুদেহী তরুণকে তিনি জিম্মি করে রাখেন নিজের হারেমে, তাদের দিয়ে মেটাতে থাকেন দেহ ও মনের ক্ষুধা। ব্যাপারটা জেনে ফেলেন আওরঙ্গজেবের কন্যা ফহর-উন-নিসা, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে তা জানিয়ে দেন পিতাকে। এ ক্রোধের বিশেষ কারণ ছিল তাঁর। রোশন আরা ওই নয় তরুণের একজনকেও ধার দিতে রাজি হয় নি তাঁকে। মুখ্য কোতোয়াল সিদি ফুলাদ তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে চোর হিসেবে, তারপর নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে।

এ ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন সম্রাট। সিংহাসন পেতে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছিলেন রোশন আরা, সে কথাও ভুলে যান তিনি। আসলে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী জীবনকে ক্ষমা করতে রাজি ছিলেন না আওরঙ্গজেব। তাঁর নির্দেশে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় তাঁকে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫৪ বছর।

বিষপ্রয়োগ

সন্দেহ, অবিশ্বাস, হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ সবসময় তাড়িয়ে ফিরতো মুগল মহল ও হারেমের নরনারীদের। এ কারণে বিষপ্রয়োগে হত্যার ঘটনা ঘটতো প্রায়ই। অতিপ্রিয় একজন কোনও কারণে অতি অপ্রিয় হয়ে উঠলে শুরু হতো হত্যার চক্রান্ত। তখন ধারালো অস্ত্রের চেয়ে বিষপ্রয়োগের ব্যবস্থাই নিরাপদ মনে করতো হারেমের ষড়যন্ত্রীরা।

সপ্তম মুগল সম্রাট শাহ আলম বা বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২)-র পুত্র মুইজদ্দিন ছিলেন প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসে জর্জরিত। এক সময় যার বর্ণনা করেছেন "রূপে সৌন্দর্যে তুলনাহীনা" হিসেবে তাকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হন তিনি। প্রথমে পানে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয় তাকে। তখন তার মা দ্রুত ছুটে যান ইতালিয়ান পর্যটক নিককোলাও মানুচচি (ভারতে অবস্থান ১৬৫৮-১৭০৭)-র কাছে। তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন তাকে। এ রকম ঘটনা ঘটে পর-পর তিনবার। তখন ব্যাপারটা জানতে পারেন মুইজদ্দিন। এরপর কোনও কাজে মানুচচি তাঁর কাছে গেলে তাঁকে দরজা থেকেই ফেরত পাঠান তিনি। চতুর্থ বার বিষপ্রয়োগের ঘটনা ঘটলে আবারও খোঁজাখুঁজি শুরু হয় মানুচচি'র। কিন্তু তখন তিনি

প্রাসাদের এই অংশে ছিল হারেম। এখন শুধুই প্রাসাদ, কান পাতলে হাহাকার, আর কখনো পর্যটকদের পদচারণা।

আওরঙ্গাবাদে সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে। দিল্লি থেকে মায়ের আকুল আবেদন নিয়ে খবর আসে, কিন্তু মানুচচিকে যাওয়ার অনুমতি দেন না শাহ আলম। এ ভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু ঘটে হারেমের সেই 'তুলনাহীনা রূপসী'র। এরপর মুইজদ্দিন বেশ খাতির-যত্ন শুরু করেছেন মানুচচি-কে।

এসব ঘটনার বিবরণ মানুচচি বিশদভাবে লিখে গেছেন বার খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর "স্তোরিয়া দো মোগোর" নামের বৃত্তান্ত-গ্রন্থে।

বলাৎকার

লাম্পট্যে কারও চেয়ে কম ছিলেন না শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬)। হারেমে শ'-শ' সুন্দরী থাকা সত্ত্বেও দরবারের অনেক বিশিষ্ট অমাত্যের পত্নী হয়েছিল তাঁর কাম-লালসার শিকার। তাদের সঙ্গে আসনাই করে তিনি মর্যাদাহানি ঘটিয়েছিলেন সেই অমাত্যদের। এতে নিজের সম্মানের, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেছিলেন শাহজাহান।

অমাত্য-পত্নীদের মধ্যে সম্রাটের বিশেষ দৃষ্টি ছিল জাফর খানের পত্নীর প্রতি। মানুচচি'র বিবরণ অনুযায়ী ওই মহিলা ছিলেন মমতাজ মহলের বোন। তাঁর প্রতি কামনায় শাহজাহান এতই অধীর হয়ে উঠেছিলেন যে জাফর খানকে পর্যন্ত তিনি চেয়েছিলেন হত্যা করতে। এই জাফর খান-ই উজির হয়েছিলেন পরে। তিনি মারা যান ১৬৭৭ অব্দে।

ওই সময় জাফর খানকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন তাঁর পত্নী। নিজেকে তিনি সঁপে দেন শাহজাহানের কাছে, বিনিময়ে শাহজাহান তাঁর স্বামীকে সুবাদার করে পাঠান পাটনায়। এরপর জাফর খানের পত্নীকে তাঁর ইচ্ছার দাসী করে নেন শাহজাহান। এভাবেই তিনি 'সম্পর্ক' করে নিয়েছিলেন আরেক অমাত্য খলিল খানের পত্নীর সঙ্গে, যদিও সম্পর্কে শাহজাহান ছিলেন তাঁর খালু। আসলে আত্মীয়তার সম্পর্ক যা-ই হোক, চোখে পড়ে গেলে কোনও মহিলারই উপায় ছিল না শাহজাহানের লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করার। অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান খলিলুলাহ'র পত্নীর সঙ্গেও 'বিশেষ সম্পর্ক' করে নিয়েছিলেন সম্রাট আসলে জাফর খান ও খলিলুলাহ'র পত্নীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আর কানাঘুষার পর্যায়ে ছিল না, সকলের সুখে-দুঃখেই ছিল তাঁদের নিয়ে আলোচনা। ওই মহিলারা যখন দরবারে যেতেন তখন ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভিখিরিরাও চিৎকার করতো তাঁদের দেখে। জাফর খানের পত্নীকে দেখলে তারা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলতো, "ওগো শাহজাহানের প্রাতঃরাশ, কিছু দান করে যান আমাদের।" আবার খলিলুলাহ'র পত্নীকে দেখলে চেঁচিয়ে বলতো, "ওগো শাহজাহানের মধ্যাহ্নভোজ, সাহায্য করুন আমাদের!" ওই মহিলারা এসব শুনেও গায়ে কোনও অপমান মাখতেন না, তাদের যথারীতি ভিক্ষা দিতে বলতেন কর্মচারীদের।

তবে কোনও রকম অভব্যতা সহ্য করতে রাজি ছিলেন না শাহজাহান। খলিলুল-াহ'র পত্নীকে নিয়ে নিজে বেলেল্লাপনা করলেও খলিলুলাহ'র বেলেল্লাপনা সহ্য করতে রাজি ছিলেন না তিনি। দরবারের রক্ষীদলের দায়িত্ব পালনের সময় খলিলুলাহ আসনাই শুরু করেন এক নর্তকী (কাম্বনী)-র সঙ্গে। তখন শাহি মহলের অমর্যাদা করার দায়ে তাঁকে প্রাণদণ্ড দিতে চান শাহজাহান, কিন্তু জাফর খানের পত্নী হস্তক্ষেপ করায় শেষ পর্যন্ত মার্জনা ভিক্ষা পান খলিলুলাহ।

মমতাজ মহলের ভাই শায়েস্তা খানের পত্নীকে পর্যন্ত লালসার শিকার করেছিলেন শাহজাহান। তবে এ জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল তাঁকে। প্রথমে তাঁর মন গলাতে অনেক ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছিলেন শাহজাহান, কিন্তু কাজ হয় নি কোনও ভাবে। শেষে পিতার সহায়তায় এগিয়ে আসেন কন্যা জাহান আরা। তিনি এক ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানান তাঁকে। আমন্ত্রণ পেয়ে কোনও কিছু সন্দেহ না করে, ভোজসভায় যোগ দেন শায়েস্তা খানের পত্নী। কিন্তু সেই ভোজসভার শেষে তিনি ধরা পড়েন শাহজাহানের পাতা ফাঁদে। তারপর প্রাচীন রোম সম্রাটদের কায়দায় শাহজাহান রীতিমত বলাৎকার করেন তাঁকে। সেই দুঃসহ অপমান মেনে নিতে পারেন নি শায়েস্তা খানের পত্নী। তিনি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেন, পরনের সেই পোশাকটা পর্যন্ত বদলান না, তারপর মারা যান ওই অবস্থাতেই। পরে এর যথাযোগ্য প্রতিশোধ নিয়েছিলেন শাহজাহান।

কাম-উদ্দীপক

যৌনক্ষমতা বাড়াতে নানা রকম ওষুধপত্র খেতেন শাহজাহান, তবে তা-ই যথেষ্ট ছিল না তাঁর জন্য। নিজের 'কামানুভূতিকে আরও উদ্দীপিত' করে তুলতে তিনি গড়ে

নিয়েছিলেন এক আয়না মহল। মহল বলতে অবশ্য একটি ঘর—২০ বর্গহাত দীর্ঘ ও ৭ বর্গহাত প্রশস্ত। এর চারপাশে ও উপরে আয়না লাগানো হয়েছিল দেড় কোটি রুপি খরচ করে। ওই ঘরে প্রিয় রমণীদের নিয়ে কামলীলায় মগ্ন হতেন শাহাজাহান, আয়নায় সেই লীলার দৃশ্য দেখে উদ্দীপিত হতেন আরও। এ ছাড়া আটদিনব্যাপী এক সুন্দরীমেলার আয়োজন করেছিলেন শাহজাহান। সে মেলায় বেচাকেনার পণ্য ছিল সুন্দরীদের দেহ।

আওরঙ্গজেব

সংযম মেনে চললেও আওরঙ্গজেব যে একেবারে ত্রুটিপূর্ণ ছিলেন তা নয়। হীরা বাই নামের এক নর্তকীর প্রতি অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন ছিলেন তিনি। কৌশলে তাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের হারেমে। হ্যাঁ, নিজস্ব হারেম আওরঙ্গজেবেরও ছিল। সেখানে নর্তকী, গায়িকা ও পত্নীদের প্রতি কিছু প্রশ্রয়ও তাঁর ছিল। মানুচচি লিখেছেন, বাহ্যিক সংযমের আড়ালে "তিনি কাটাতেন এক গোপন আমোদ-প্রমোদের জীবন। এক নর্তকীর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল তাঁর। সেই নর্তকীর কারণে তিনি পাণপাত্রও তুলে নিয়েছেন ঠোঁটে।" তবে সেই নর্তকীর নাম লেখেন নি মানুচচি।

পরবর্তী মুগল আমলে

অষ্টম মুগল সম্রাট জাহানদার শাহের শাসন ছিল স্বল্পকালীন (১৭১২-১৩)। এই সময়ে দিল্লি'র মহল ও হারেমে সহিংসতা ও ব্যভিচার পৌঁছেছিল তুঙ্গে। লাল কুঁয়ার নামের এক বেশ্যার প্রতিষ্ঠা তখন শীর্ষে। কথায়-কথায় তার ভাই ও আত্মীয়-স্বজনেরা পেয়ে যায় চার বা পাঁচ হাজারি মনসব। আর উপহার পায় হতি, বাদ্যবাজনা ও রত্ন জহরত, দরবারে উচ্চপদ সহ আরও অনেক কিছু। ওদিকে দরবার থেকে বিতাড়িত হয় জ্ঞানী-গুণীজন সকলে। হারেম ভরে যায় দালাল, বেশ্যা, বাজনাদার আর জাদুকর-বাজীকরে। ফররুখ সিয়ার (নবম মুগল সম্রাট, ১৭১৩-১৯) নিহত হওয়ার পর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন সাইয়িদ ভ্রাতৃদ্বয়। তাদের মধ্যে সাইয়িদ আবদুল্লাহ খান ছিলেন "অত্যন্ত নারীসঙ্গপিপাসু। নিহত সম্রাটের হারেমের দু'-তিনজন সুন্দরী তাঁকে এত মুগ্ধ করেছিল যে তাদের তিনি নিয়ে যান নিজের হারেমে—যদিও সেখানে তাঁর ভোগের জন্য ছিল ৭০-৮০জন সুন্দরী তরুণী।

পর্যটকদের বৃত্তান্ত

শাহজাহানের সঙ্গে মমতাজ মহলের বোন ফারজানা বেগমের সম্পর্কের বিবরণ দিয়েছেন মানুচচি। তিনি লিখেছেন, ফারজানা'র এক পুত্রের জনক যে শাহজাহান "এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। কারণ ওই পুত্রটি দেখতে হুবহু শাহজাদা দারা শুকের মতো।"

হারেম সুন্দরীদের নাচ ও গান, হয়তো নিজেদের কিংবা সম্রাটদের জন্য।

পরিবেশটা উৎসবের। ভেতরে না হোক, বাইরে তো বটেই।

জাহার আরা'র সাহায্যে শাহজাহান কর্তৃক শায়েস্তা খানের পত্নীকে বলাৎকারের ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন স্পেনিশ (খ্রিস্টান্দ) ভিখু সেবাসতিয়ার সাবরিক (ভারতে অবস্থান ১৬৩০-এর দশকে)। আর জাহান আরা-কে জড়িয়ে শাহজাহানের বিরুদ্ধে অজাচারের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন য়োয়ানেস দে লায়েত, পিটার মানভি, জ্যাঁ বাপতিস্ত, তাতেরভিয়ের ও ফ্রাঁসোয়া বেরাজিয়ের। তবে ঐতিহাসিক কে. এস. লাল লিখেছেন, "একটি গুজবকে পুরোপুরি কেলেঙ্কারিতে পরিণত করেছে" আওরঙ্গজেবের সমর্থকমহল। তিনি লিখেছেন, "আওরঙ্গজেব অবাধ্যতা করেছেন শাহজাহানের সঙ্গে, বছরের পর বছর তাঁকে কারারুদ্ধ করে রেখেছেন, কিন্তু জাহান আরা'র প্রতি শাহজাহানের পিতৃস্নেহকে কেলেঙ্কারিতে পরিণত করে সবচেয়ে নিষ্ঠুর অন্যায় করেছেন পিতার প্রতি। কে. এস. লাল মন্তব্য করেছেন, "তবে পরিস্থিতি এমন যে চূড়ান্ত করে বলা যায় না কিছুই।"

সংযোজন

...বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজা-মহারাজা-নবাব-নিজামদের হারেমে, লীলাভবন বা রঙমহলে, যে প্রমত্ত কামলীলা চলেছে তার বিবরণ লজ্জা দিতে পারে নিরো'র সময়কার রোমকেও...

এখানে সংযোজিত হলো এইসব হারেমের কিছু কথা ও কাহিনী, কেচ্ছা ও কেলেঙ্কারি, যা চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল গত শতকের প্রথম কয়েকটি দশকের বিভিন্ন সময়ে...

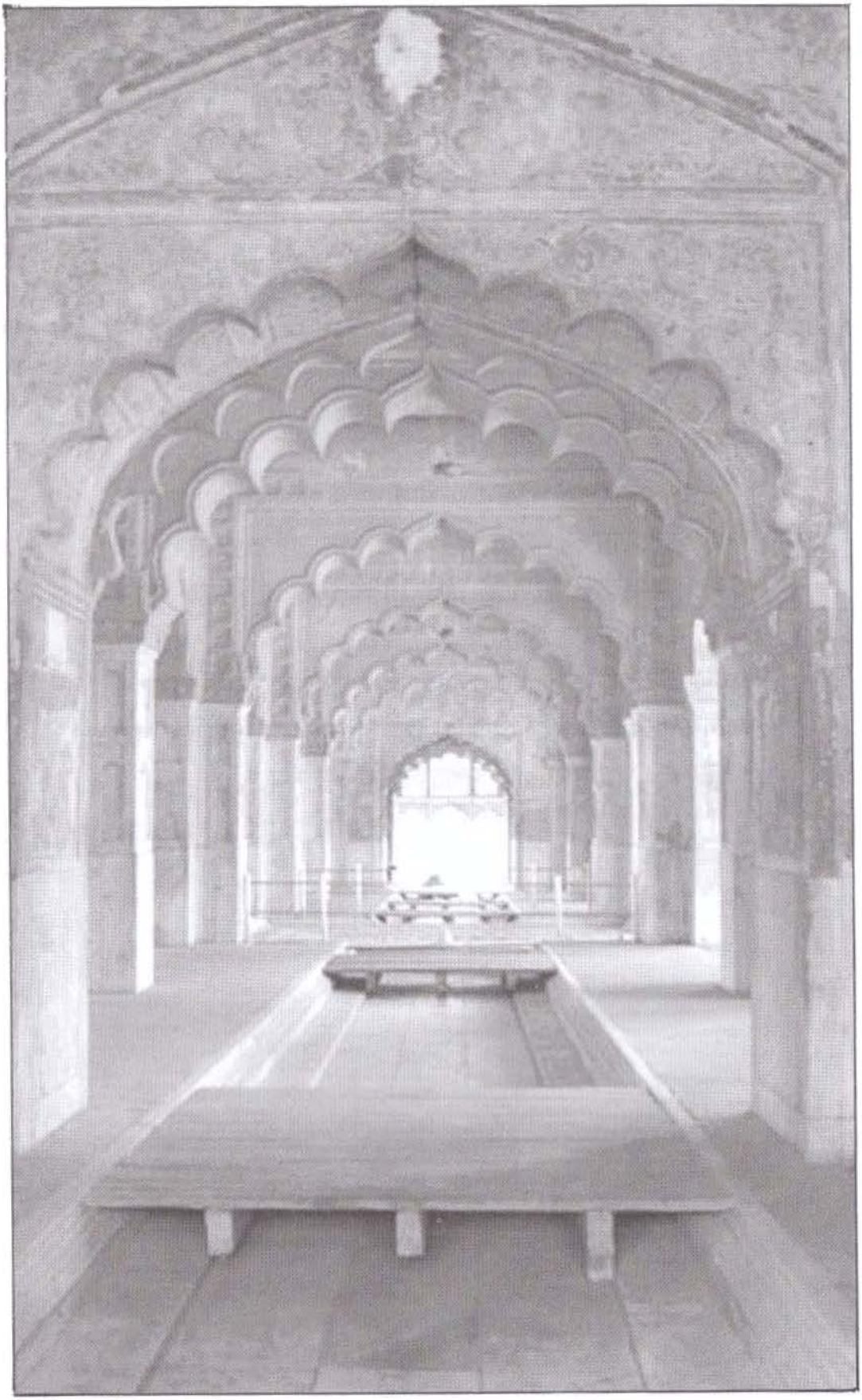

স্প্যানিশ মহারানী

যৌবনে হায়দারাবাদের নিজাম ওসমান আলি নানা বিচিত্র পথে টাকা-পয়সা ওড়াতেন আর রত্ন-জহরত বিলিয়ে বেড়াতেন।

একবার কপুরথালা রাজ্যের স্প্যানিশ মহারানী প্রেম কাউর-এর অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা শুনে তিনি কপুরথালার অধিপতি মহারাজা জগজিৎ সিংকে আমন্ত্রণ জানান— কয়েক দিনের জন্য হায়দরাবাদ বেরিয়ে যেতে। সেখানে তাঁরা গেলে মহারানীর সৌন্দর্যে নিজাম এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে মহারাজা ও মহারানীকে আর ছাড়তেই চান না। ফলে কয়েক সপ্তাহ কেটে যায় অনুনয় আর পীড়াপীড়ির মধ্যে।

প্রতি রাতে ডিনার-টেবিলে মহারানী প্রেম কাউর তাঁর সামনে রাখা ন্যাপকিনের মধ্যে মূলবান রত্ন-জহরত উপহার পেতেন। হীরা বা আংটি বা কণ্ঠহার বা অন্য কোনও মূল্যবান রত্ন সযত্নে রাখা হতো ওই ন্যাপকিনের ভাঁজে।

এভাবে সম্মান ও সৌজন্যের সঙ্গে মহারানীকে হীরা-জহরত উপহার দেয়া চলতে থাকে কয়েক সপ্তাহ ধরে। কিন্তু নিজাম কোনও সুযোগেই পান না মহারানীর সঙ্গে একান্তে দেখা করার। কারণ জগজিৎ সিং স্ত্রীর ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ, নিজামের সামনে স্ত্রীকে এক সেকেন্ডের জন্য একা যেতে দিতেও তিনি রাজি ছিলেন না তিনি।

ওদিকে নিজামের আর ধৈর্য নেই। শেষ পর্যন্ত তিনি শরণাপন্ন হন প্রধানা বেগমের। পরে 'শাহি কোঠি'তে মহারানীর সম্মানে এক পার্টির আয়োজন করেন প্রধানা বেগম। মহারাজা আপত্তি করেন না এতে। প্রধানা বেগম আপ্যায়িত করবেন মহারানীকে—এতে দোষের কি আছে?

মহারানী, তাঁর দুই দেহরক্ষী ও এক সহচরী সহ গাড়ি যখন প্রাসাদে পৌঁছে তখন প্রধান খোজা প্রহরী আবদুর রহমান জানায় : মহারানী ও তাঁর ফরাসি সঙ্গিনী মাদমোয়াজল লুইস দুজঁ শুধু ভেতরে যেতে পারবেন, দেহরক্ষী দু'জনকে বসে থাকতে হবে ফটক-সংলগ্ন কামরায়।

মহারানী প্রাসাদের ভেতরে ছিলেন কয়েক ঘণ্টা। ওদিকে কিছু-একটা কারসাজি হয়েছে সন্দেহ করে মহারাজার সময় কাটে চরম উৎকণ্ঠায়। কিন্তু উপায় কিছু নেই। প্রাসাদের ভেতরে মহারানী কোথায় কি করছেন তা জানার কোনও সুযোগ ছিল না। কারণ ভেতরে খবর পাঠানো বা ভেতর থেকে খবর আনার সব পথ ছিল বন্ধ।

মহারানী পরে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে জানিয়েছিলেন যে, ফটক পেরিয়ে কয়েক গজ যাওয়ার পরই নিজাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যান বেগমদের মহলে। সেখান থেকে নিয়ে যান তাঁর নিজের মহলে। সেখানে তাঁকে আপ্যায়িত করেন চা-পানে। মহলের ওই কামরায় তখন আর কেউ ছিল না। তাঁর ও নিজামের মধ্যে অন্য কিছু ঘটেছিল কিনা তা অবশ্য মহারানী কাউকে খুলে বলেন নি, তবে তাঁর ভাবসাব দেখে মনে হয়েছে-— নিজামের আপ্যায়নে তিনি খুব প্রীত।

মহারাজা ওদিকে রেগে কাঁই। মহারানীকে নিজামের প্রাসাদে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে তাঁর আফশোসের সীমা ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি হায়দরাবাদ ত্যাগ করেন, আর কখনও যান নি সেখানে। কয়েক মাস পর নিজাম এক টেলিগ্রাম পাঠান : বিনিময়-সফরে তিনি কপুরথালা আসতে ইচ্ছুক। মহারাজা তখন টেলিগ্রামে জানিয়ে দেন : তিনি ইউরোপে যাচ্ছেন, কাজেই মহামান্য নিজামকে অভ্যর্থনা জানাতে পারছেন না। এরপর স্পেনদেশীয় এক সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ ওই দুই রাজ্যাধিপতির সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায় একেবারে।

লীলা-ভবন

পাতিয়ালা'র অধিপতি মহারাজা ভূপিন্দর সিং প্রথম যৌবনে প্রেমাচারের জন্য এক প্রাসাদ বানিয়েছিলেন 'লীলা-ভবন' নামে। ওই প্রাসাদটি ছিল পাতিয়ালা শহরে—ভূপিন্দর নগর যাওয়ার রাস্তার ওপর বারাদারি উদ্যানের কাছে। এর প্রবেশপথ ছিল মাত্র একটি। বিশাল লৌহফটকের পর উদ্যানের ভেতর দিয়ে গেছে সেই আঁকাবাঁকা পথ। রাস্তা থেকে প্রাসাদের ভেতর কয়েক গজ মাত্র জায়গা যাতে দেখা যায় সেজন্যই অমন আঁকাবাঁকা করা হয়েছিল পথটি। প্রাসাদের চারপাশের দেয়াল ছিল ৩০ ফুট উঁচু, সে-দেয়ালও বানানো হয়েছিল আঁকাবাঁকা করে। দেয়ালের কাছ দিয়েই ছিল বিশাল ও দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস ও অন্যান্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গাছের সারি। এতেও ভেতরটা হয়েছিল লোকচক্ষুর আড়াল। আঁকাবাঁকা পথ ধরে কয়েক শ' গজ যাওয়ার পর চোখে পড়তো অপূর্ব সুন্দর এক ফুলের বাগান। অমন বাগান সারা ভারতে আর দু'টি ছিল না সেকালে। প্রাসাদ-ভবন ছিল মূল্যবান আসবাবপত্র ও নয়নাভিরাম সাজসজ্জায় পরিপাটি। এতে কয়েকটি বেডরুম ছিল বারান্দাঘেরা—ইউরোপীয় রীতিতে সাজানো।

ভবনে একটি বিশেষ কামরা ছিল—যা অভিহিত হতো 'প্রেম-কানন' নামে। এটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল মহারাজার জন্য। কামরার চার দেয়ালই আবৃত ছিল প্রাচীর ও দুর্লভ ছবিতে। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ওই ছবিগুলো আসলে ছিল পুরোপুরি কামকেলি-বিষয়ক যৌন-আসনের কয়েক শ' ভঙ্গি।

'প্রেম-কানন' সাজানো হয়েছিল ভারতীয় রীতিতে। মেঝের কার্পেট ছিল মুক্তা, চুনি, হীরা ও অন্যান্য দামি রত্নে খচিত। নীল ভেলভেটের বালিশগুলোও খচিত ছিল অনেক মূল্যবার রত্নে। বিলাসবহুল শয্যাটি ছিল দোলনা-জাতীয়—ডানে বাঁয়ে সেটি দুলতো। মহারাজার বিনোদন-ব্যবস্থা ছিল এমনই পরিপাটি। ভবনের বাইরে ছিল শ' দেড়েক নরনারীর একসঙ্গে স্নান করার উপযোগী বেশ বড় সড় এক সুইমিং পুল।

মহারাজা ভূপিন্দর সিং জাঁকজমকপূর্ণ পার্টির আয়োজন করতেন প্রায়ই। অপূর্ব বিলাসের জন্য বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিলসে সব পার্টি। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে ওইগুলোতে মহারাজা তাঁর প্রিয় রমণীদের আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর সঙ্গে স্নানে অংশ নিতে।

ওই স্নানলীলায় তিনি দু'-তিনজন বিশ্বস্ত অমাত্য এবং পরিবারের কয়েকজন প্রিয় সদস্যকেও ডাকতেন মাঝে-মধ্যে।

গ্রীষ্মকালে সুইমিং পুলের জন্য পানি আনা হতো নিকটবর্তী খাল ও জলাধার থেকে। আর গরম পানিকে সহনীয় শীতল করে তোলার জন্যে বরফের বিশাল-বিশাল খণ্ড ফেলা হতো তাতে। ওই ভাসমান বরফখণ্ডগুলো ধরে-ধরে সাঁতার কাটতো পুরুষ ও মহিলা সঙ্গীরা, তাদের হাতে থাকতো হুইস্কির গ্লাস। মহিলারা সর্বাঙ্গে সুগন্ধি মেখে সুইমিং পুলে নামতেন, ফলে মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করতো পানি।

স্বচ্ছ সাঁতার-পোশাক পরা ৫০-৬০ জন রমণী বরফখণ্ড ধরে ভেসে-ভেসে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করছে—এর চেয়ে জমকালো কোনও দৃশ্য হয়! কখনও-কখনও এমন পার্টি চলতো সারা রাত। তখন কেউ-কেউ মগ্ন হতো স্নানলীলায়, কেউ-কেউ মত্ত হতো নাচগানে। পুলের কাছে গাছের নিচে বসে কোনও-কোনও যুবতী সুর ভাঁজতো গুনগুন করে।

এ-ধরনের লীলা-বিলাস সাধারণত অনুষ্ঠিত হতো চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমের দিনগুলোতে অথবা মনসুনের সময়ে। তখন সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে খাদ্য পরিবেশন করা হতো। লাঞ্চ বা ডিনারের খাবার নয়—অতিউপাদেয় নামী-দামি খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করতো সুন্দরী পরিচারিকারা। মূল প্রাসাদ-ভবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ ভবনে তখন থাকতো অমাত্য, ভৃত্য ও সৈনিক প্রহরীরা। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতো টেলিফোনের মাধ্যমে অথবা এক গোপন পথে বার্তাবাহক পাঠিয়ে। ওই গোপন পথ পাহারা দিতো কয়েকজন অশীতিপর নিরীহ বৃদ্ধ। তাদের চুল-দাড়ি সব পাকা, সাদা। মহারাজার কোনও বার্তা থাকলে তা তারাই পৌঁছে দিতো কর্তব্যরত অমাত্যের কাছে।

লীলা-বিলাসে যোগদানকারী মহারানীদের ও অন্য রমণীদের নিয়ে মোটরগাড়ি সোজা ঢুকে পড়তো প্রাসাদের ভেতরে, কিন্তু অমাত্য বা রাজ-পরিবারের সদস্যদের গাড়ি রেখে আসতে হতো ফটকের বাইরে।

লীলা-ভবনের সুইমিং পুল সত্যিই যেন হিমবাহে পরিণত হতো গ্রীষ্মকালে। বাইরে তাপমাত্রা যখন ১৪৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট, তখন ওই পুলের পানি ৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)-এর উপরে উঠতো না।

এসব অনুষ্ঠানে ক্বচিৎ আমন্ত্রণ পেতেন কোনও বিদেশী। ওই সময়ে মোতিবাগ প্রাসাদে যদি কোনও ইউরোপীয় বা আমেরিকান মহিলা থাকতেন মহারাজার অতিথি হিসেবে, এবং তাঁর সঙ্গে যদি মহারাজার আসনাই থাকতো, তবে তাঁকে অনুমতি দেয়া হতো বরফশীতল সেই স্বপ্নসায়রে ভেসে বেড়ানোর।

সুইমিং পুলে মোমবাতি-নৃত্য

তিরিশ দশকের গোড়ার দিকে চল্লিশ মোমবাতির কেচ্ছা বেশ হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল মধ্যভারতে। ভরতপুরের অধিপতি হিজ হাইনেস মহারাজা কিষেণ সিং নানা ধরনের অদ্ভুত বিলাসের জন্য সুপরিচিত ছিলেন বিশেষভাবে। সাঁতার কাটা ছিল তাঁর প্রিয় ক্রীড়া। এজন্য গোলাপি রঙের মর্মর পাথর দিয়ে এক চমৎকার সুইমিং পুল বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। বাছাই-করা ৪০ জন সহচরী নিয়ে সে পুলে তিনি মগ্ন হতেন বিচিত্র সব স্নানলীলায়।

মহারাজা ও তাঁর শিল্পী-কারিগররা অনেক মাথা ঘামিয়ে এবং অসম্ভব কল্পনা-নৈপুণ্য দিয়ে এক চন্দনকাঠের সিঁড়ি তৈরি করেছিলেন ২০ ধাপের। এর প্রতিটি ধাপের দু'পাশে দু'জন করে মোট ৪০ জন সুন্দরী দাঁড়িয়ে থাকতো সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। ওইভাবে তারা সুইমিং পুলে বরণ করে নিতো মহারাজাকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার সময় মহারাজা ওই বিবসনাদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করতেন, কাউকে কাছে টানতেন, কাউকে ঠেলা মারতেন। এভাবে ৪০ রমণীকে দর্শন করে তিনি নামতেন সুইমিং পুলে। ওই রমণীদের সঙ্গে থাকতো একটি করে বিশেষভাবে নির্মিত মোমবাতি। তারা যখন মাত্র দুই ফুট গভীর পুলে নামতো তখন সকল বৈদ্যুতিক বাতি নিভিয়ে ফেলা হতো। এরপর নগ্ন রমণীরা নিজেদের দেহের মধ্যভাগে নাভির নিচে মোমবাতি আটকিয়ে তা জ্বালতো। এতে তাদের কোমরের বাঁক ও গোপনাঙ্গ স্পষ্টভাবে দেখা যেতো। তখন শুরু হতো বিচিত্র নাচ। ওই নাচের সময় রমণীরা চেষ্টা করতো পানির ঝাপটা লেগে মোমবাতি যাতে না নিভে যায়। মহারাজাকে মাঝখানে রেখে নগ্ন যুবতীরা মেতে উঠতো ওই অদ্ভুত স্নানলীলায়। আর একের পর এক মোমবাতি নিভতো পানির ঝাপটায়। যে পর্যন্ত না শেষ মোমবাতিটি নিভতো সে-পর্যন্ত চলতো জলকেলি। যে রমণী শেষ পর্যন্ত তার মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখতে পারতো সে পুরস্কৃত হতো বিশেষভাবে। রাতের নায়িকা হিসেবে ঘোষণা করে মহারাজা অনেক মূল্যবান উপহার-সামগ্রী দিতেন তাকে। এছাড়া সে মহারাজার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার সম্মানও অর্জন করতো ওই রাতে।

নীলনয়না

পাঞ্জাবে অবস্থিত নাভা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন হিজ হাইনেস ফরজন্দ-ই-আরজুমন্দ আকিদাত-পালমন্দ মহারাজা রূপদমন সিং। পাঞ্জাব অধিপতি মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর ওই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। 'ফুলকিয়া' নামে অভিহিত সে কালের ছোট-ছোট রাজ্যগুলির শাসকরা একে অন্যের জ্ঞাতিভ্রাতা হলেও দ্বন্দ্ববিরোধ লেগেই ছিল তাঁদের মধ্যে। বিশেষ করে পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং ও নাভা'র মহারাজা রূপদমন সিংয়ের মধ্যে ছিল তীব্র সংঘাত। ওই রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত এক গ্রাম থেকে রচনী নামের এক তরুণীকে পাতিয়ালার মহারাজার লোকজন অপহরণ করার পর দু'জনের বিরোধ ওঠে তুঙ্গে।

এক কৃষকের কন্যা রচনী ছিল হালকা-পাতলা গড়নের অত্যন্ত সুন্দরী এক তরুণী। তার মাথার চুল ছিল সোনালি, আর চোখ দু'টি ছিল নীল। পাঞ্জাবে এ ধরনের সৌন্দর্য শুধু বিরল নয়, অস্বাভাবিকও। নাভা'য় বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ করেই তাকে দেখে ফেলেছিলেন পাতিয়ালার মহারাজা।

রাস্তার ধারে একটা বুনো কৃষ্ণসার হরিণ দেখে গুলি করেন তিনি। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হয়, আর হরিণটি ছুটে পালায়। মহারাজা তখন তার গাড়ির ড্রাইভারকে বলেন গ্রাম-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সেটার পিছু ধাওয়া করতে। শেষ পর্যন্ত মাসানা নামের এক গ্রামের কাছে গুলি করে মারা সম্ভব হয় হরিণটিকে। ওই শিকার দেখতে তখন ভিড় জমায় গ্রামের সকল আবাল বৃদ্ধ বনিতা। আর তখনই ওই ভিড়ের মধ্যে রচনীকে দেখে ফেলেন মহারাজা। প্রথম দেখাতেই কেমন যেন ঘোর লেগে যায় তাঁর।

মেয়েটির পিতা-মাতার কাছে খবর পাঠানো হয় বেশ কয়েকবার। কিন্তু নাভা'র মহারাজার নির্দেশ অনুসারে মেয়েকে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানায় তাঁরা। অনুরোধ-প্রলোভনে কাজ না হওয়ায় কয়েকজন সেনা কর্মকর্তার সহায়তায় রচনীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় পাতিয়ালায়। সেখানে এক প্রাসাদে মহারাজার অন্যতম রক্ষিতা হিসেবে রাখা হয় তাকে। এই ঘটনার সূত্রে দুই মহারাজার সম্পর্কে ঘটে মারাত্মক অবনতি।

রূপদমন সিং পালটা ব্যবস্থা হিসেবে বেশ ক'জন তরুণী-যুবতীকে একই কায়দায় ধরে নিয়ে যান পাতিয়ালা থেকে। দুই মহারাজার মধ্যে বিরোধ আরও বেড়ে যায় এতে। এক পর্যায়ে নাভা'র মহারাজা তাঁর সেনাবাহিনী পর্যন্ত পাঠান পাতিয়ালা'র দিকে। দুই রাজ্যাধিপতির সৈন্যদল অনেকগুলো খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাতে হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায়

প্রচুর।

শেষ পর্যন্ত বৃটিশ ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করে ওই রক্তপাতের ঘটনায়। এক তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। ঘোষণা করা হয় : কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভাইসরয় বিচার করে দেখবেন—হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও রক্তপাতের মতো গুরুতর অপরাধের জন্য কোন মহারাজা দায়ী। তদন্ত চলে দু'বছর ধরে। তারপরও নানা টানাহেঁচড়া চলে, তাহলেও শেষ পর্যন্ত ভাইসরয় রায় দেন পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিংয়ের পক্ষে। ওই রায়ে রূপদমন সিংকে বলা হয় সিংহাসন ত্যাগ করতে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে বসবেন—এটাই স্থির হয়।

গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট কর্নেল মিনচিন-কে ভাইসরয় পাঠান মহারাজাকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাতে। ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনীর এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য এবং আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিশেষভাবে আনা একদল অশ্বারোহী দেহরক্ষী নিয়ে কর্নেল মিনচিন প্রাসাদ-পরিবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করেন ঘোড়ার পিঠে চড়ে। গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট এসেছেন—এ খবর পেলেন মহারাজা রূপদমন সিং, কিন্তু তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে দেখা করলেন না তাঁর সঙ্গে। প্রাসাদের ভেতর তখন তর্ক চলছিল : মহারাজা আত্মসমর্পণ করবেন না লড়বেন। দেরি দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে কর্নেল মনচিন চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও, আকালি, বেরিয়ে আয়।" ভারতে আকালি শিখদের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল ওই সময়। আর আকালিদের সঙ্গে মহারাজার কিছু দহরম-মহরম আছে বলে সন্দেহ করতো ব্রিটিশ সরকার। রূপদমন সিং যখন দেখলেন এক ব্যাটেলিয়ন ব্রিটিশ পদাতিক সৈন্য নিয়ে কর্নেল মিনচিন হাজির হয়েছেন তখন আর দেরি না করে আত্মসমর্পণ করেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে এক আবদ্ধ গাড়িতে করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল আমবালা রাজ্যের বাইরে। পরে সেখান থেকে তাঁকে নেয়া হয় দক্ষিণ ভারতের কোদাইকানাল-এ। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় নির্বাসিত অবস্থায়।

সর্প-পরীক্ষা

কোনও সুন্দরীর প্রতি গভীর কাম-বাসনা জাগ্রত হলে নাভা রাজ্যের হিজ হাইনেস মহারাজা রূপদমন সিং নানা বিচিত্র ও নাটকীয় পদ্ধতিতে মন জয় করতে চাইতেন তার। সে সব কেচ্ছা-কাহিনী রাজ্যের লোকজন কমবেশি জানতো, তবে বলাবলি করতো না কখনও। মহারাজার যৌন উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য সুন্দরীদের ওপর নানা ধরনের দৈহিক নির্যাতনও চালানো হতো, তবে তা জানতো শুধু তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীরা। নিজের বিকৃত লালসা চরিতার্থ করার জন্য মহারাজা যে নিরীহ কুমারী মেয়েদের নিয়ে নানা নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠতে ভালবাসেন—সে-সম্পর্কে সচেতন ছিল তারা।

রাজকীয় সফরে নগর-পরিক্রমায় বেরিয়ে নাভা'র পথে প্রীতম কাউর নামের এক তরুণীকে দেখতে পান মহারাজা। তিনি প্রাসাদে ডেকে পাঠান তিনি। কিন্তু সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানায় সে। প্রীতমের পিতা ছিলেন নাভা সরকারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। মহারাজা তাঁকে ডেকে পাঠান এবং মেয়েকে বিয়ে দিতে বলেন তাঁর সঙ্গে। কিন্তু সে প্রস্তাব তিনিও প্রত্যাখান করেন।

প্রীতম ছিল শিক্ষিত তরুণী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ ডিগ্রি নিয়েছিল সে। মন-মানসিকতায় সে যেমন উন্নত ছিল, তেমনই ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। মহারাজার সভাসদরা নানাভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে মহারাজার সামনে হাজির করানোর চেষ্টা করে, কিন্তু প্রীতম রাজি হয় না কিছুতেই। মহারাজার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অনেক দূত তার সঙ্গে দেখা করেও ব্যর্থ হয়।

মাসের পর মাস চলে যায়, কিন্তু মহারাজার কুমতলব আর হাসিল হয় না কিছুতেই। ওদিকে জটিলতা এড়াতে প্রীতমের পিতা-মাতা তার বিয়ে ঠিক করেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি শমশের সিং-এর পুত্রের সঙ্গে। মহারাজার কানে এ-খবর পৌঁছে যায় যথারীতি, সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এ-বিয়ে ভেঙে দেন তিনি। তখন বিপদ বুঝে রাজ্য ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন প্রীতমের পিতামাতা। কিন্তু রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছার আগেই পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁদের। এক কারাগারে আটক রাখা হয় তিনজনকে। সেখানে বেশ কিছুদিন অনাহারে রাখা হয় তাঁদের, মারধরও করা হয় যথেষ্ট। তারপর মেয়ের কাছ থেকে আলাদা করা হয় পিতামাতাকে। একই কারাগারের ভিন্ন-ভিন্ন কুঠরিতে রাখা হয় তাঁদের—কেউ আর দেখতে পান না কাউকে।

মহারাজা তখন বুটা নাম ধারণ করে এক কয়েদি সেজে প্রীতম ও তার পিতা-মাতার

সঙ্গে দেখা করতে থাকেন। প্রীতমের কুঠরির পাশের কুঠরিটি সহকয়েদি বুটা'র জন্যে বরাদ্দ করা হয়, আর তিনি তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাকে নানারকম খোশগল্প শোনাতে থাকেন। এভাবে বুটা এবং প্রীতম ও তার পিতামাতার মধ্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। এরপর পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বখতিয়ার সিং-এর সহায়তায় বুটা অনেকগুলো বিষধর সাপ যোগাড় করেন, তবে ভাল করে দেখে নেন সেগুলোর বিষদাঁত ভাঙা কিনা।

মধ্যরাতের দিকে, প্রীতম যখন মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে, তখন দরজার শিক গলিয়ে সাপগুলো ছেড়ে দেয়া হয় তার কুঠরিতে। একটু পরেই তার গলা বেয়ে উঠতে থাকে সেগুলো। ঘুম ভেঙে যায় প্রীতমের, সে দেখে : তার হাত-পা পেঁচিয়ে ধরেছে ভয়ঙ্কর সব সাপ। তখন বাঁচাও-বাঁচাও বলে সে চেঁচাতে থাকে প্রাণপণে, কিন্তু এগিয়ে আসে না কেউই। তারপর এক নাটকীয় মুহূর্তে বুটা প্রবেশ করেন কুঠরিতে, আর পায়ের ভারি বুটজুতা ও হাতের বল্লম দিয়ে সাপগুলোকে মারতে থাকেন নির্দয়ভাবে। বুটাকে ওই জুতা ও বল্লম সরবরাহ করেছিলেন পুলিশ সুপরিনটেনডেন্ট। ওই বিশেষ মুহূতে বুটা যখন একটির পর একটি সাপ মেরে চলছিলেন, তখন তিনি এক হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলেন প্রীতমকে—তার স্তনযুগল বিশেষভাবে চেপে রেখেছিলেন নিজের বুকের সঙ্গে।

ওদিকে প্রীতমের পিতামাতাসহ সকল কয়েদি সমবেত হয় কুঠরির বাইরে। সব ক'টা সাপ খতম না হওয়া পর্যন্ত ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করেই চলছিল প্রীতম। শেষে মূর্ছা যায় সে। তাড়াতাড়ি জেল-ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়, তিনি প্রয়োজনীয় সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে। ভোরের দিকে সংজ্ঞা ফেরে প্রীতমের, সে তখন তার জীবন রক্ষাকারী বুটাকে কাছে ডাকে—তার প্রতি প্রকাশ করে গভীর কৃতজ্ঞতা। পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেলও ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন কারাগারে। বুটা, প্রীতম ও তার পিতামাতাকে তিনি অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার হুকুম করেন। মুক্তি পেয়ে রাজ্যের বাইরে এক প্রত্যন্ত গ্রামে চলে যান তাঁরা।

কিছুদিন পর প্রীতমের পিতামাতার সম্মতিতে বিয়ে হয়ে যায় বুটা ও প্রীতমের। বিয়ের পর ওই গ্রাম ছেড়ে প্রীতমকে নিয়ে বুটা রওনা হন নিজ শহরের উদ্দেশে। তারপর বুটা যখন তাকে নিয়ে যান প্রাসাদে কেবল তখনই তার আসল পরিচয় জানতে পারে প্রীতম ও তার পিতামাতা। প্রাসাদের জাঁকজমক ও আমোদ-স্ফূর্তির মধ্যে কয়েক মাস তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখেই কাটে, তারপর সেই সরল শিক্ষিত মেয়েটিকে অন্যান্য অনেক নারীর মতোই ছুড়ে ফেলা হয় এক প্রাচীন দুর্গের অভ্যন্তরে। সেখানে তার বাকি জীবন কাটে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে। মহারাজার বিশ্বাসঘাতকতায় মর্মাহত হয়ে প্রীতমের পিতামাতা প্রাণত্যাগ করেছিলেন আগেই।

নাচওয়ালি

মহারাজা তুকো জি রাও হোলকার লেখাপড়া করেছিলেন ইনদোর-এর ডালি কলেজে—যা লাহোরের এইচিসন চিফ'স্ কলেজ, আজমিরের মেয়ো কলেজ ও রাজকোটের রাজকুমার কলেজের মতো বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিল অভিজাতদের জন্যে। এসব কলেজ থেকে যারা বেরিয়ে আসতো তাদের মেধা, মনন ও দৃষ্টিভঙ্গি হতো বিচিত্র।

আসলে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য সৃষ্টি করাই ছিল ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। কলেজগুলো থেকে বেশির ভাগ যুবরাজ ও সরদার বেরিয়ে আসতো কুশিক্ষা নিয়ে। ইংরেজরাই মূলত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতো এসব কলেজ। প্রিন্সিপাল ও সিনিয়র প্রফেসর থাকতেন ইংরেজ, আর জুনিয়র শিক্ষক ও ধর্মীয় শিক্ষক থাকতেন ভারতীয়। এমন একটা ধর্মান্ধ পরিবেশে লেখাপড়া করানো হতো যে শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা নিয়ে বড় হতো। কলেজ-প্রাঙ্গণে থাকতো বিভিন্ন প্রার্থনাগৃহ—মুসলমানদের জন্য মসজিদ, হিন্দুদের জন্য মন্দির, খ্রিষ্টানদের জন্য চার্চ এবং শিখদের জন্যে গুরুদ্বার। প্রশিক্ষণের সময় ধর্মীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হতো সবচেয়ে বেশি।

ব্রিটিশ রাজনীতিকরা চাইতেন এসব কলেজে কড়াকড়িভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হোক—যাতে বিভিন্ন রাজ্যের ভবিষ্যৎ-শাসকরা হতে পারেন বিশেষ রকম সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী । এজন্যই বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপে বিভক্ত করে শিক্ষা দেয়া হতো তাদের। বস্তুত ইংরেজদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' অর্থাৎ বিভেদ-নীতির কৌশলটি এসব কলেজে বজায় ছিল পূর্ণমাত্রায়।

কলেজগুলো থেকে ছেলেরা বেরিয়ে আসতো সব ধরনের কু-অভ্যাস নিয়ে, বিশেষ করে শৈশবেই পানাসক্ত হয়ে পড়তো তারা। মহারাজাদের আত্মীয়স্বজনদের রাখা হতো রাজপুত্রদের দেখাশোনার কাজে। এরাই তাদের অভ্যস্ত করে তুলতো পানাহারে। দোকান থেকে মদ কিনে তা সোডাওয়াটারের বোতলে ভরে (নজর এড়ানোর জন্য) তারা নিয়ে আসতো, পরে বোতলগুলো পুঁতে ফেলতো বাগানে।

রাতে শিক্ষকরা যখন ডিনার খেতে বা নাচ-গান করতে ক্লাবে চলে যেতেন তখন কিশোর রাজপুত্ররা ওই বোতলগুলো খুলে মেতে উঠতো পানাহারে। এভাবেই অতি অল্প বয়সে নেশাগ্রস্ত হতো তারা। ইংল্যান্ডের হ্যারো ও ইটন থেকে এ-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল একেবারেই আলাদা। এই চিফ'স্ কলেজগুলোতে মহারাজাদের পুত্রদের সঙ্গে

আচার-আচরণ করা হতো রাজকীয় রীতিতে, অন্যদিকে সরদারদের পুত্রদের দেখা হতো ভিন্নভাবে। সেই ছোটবেলা থেকেই সরদার-পুত্রদের অভিবাদন ও চাটুকারিতার মধ্যে বড় হতো রাজপুত্ররা, তাই তাদের মধ্যে জন্ম নিতো দারুণ হামবড়া ভাব।

মহারাজা তুকো জি রাও যখন কলেজে পাঠ সাঙ্গ করে সিংহাসনে বসলেন তখন এক মহানৃপতি ভাবতে লাগলেন নিজেকে। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা নিয়েছিলেন যা অন্য শাসকরা পেতেন না। একটি ব্রিটিশ গার্ড অব অনার এবং দিল্লির দরবারে একজন দূত রাখার অনুমতি তাঁকে দেয়া হয়েছিল। কালক্রমে তাঁর মাথা আরও গরম হয়ে যায়, রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ও ভারতের ভাইসরয়দের সঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করতে থাকেন তিনি। বিভিন্ন ব্যাপারে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আপিলও দায়ের করেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস (যিনি পরে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড হিসেবে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন) একবার এসেছিলেন ভারত সফরে। তখন আমন্ত্রিত হয়ে তিনি গিয়েছিলেন ইনদোর-এ। ভোজসভায় মহারাজা শতমুখে প্রশংসা করতে থাকেন জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ও তাঁর সেনাধ্যক্ষদের, এতে প্রিন্স অব ওয়েলস খুবই বিরক্ত হন। ফলে ভারত সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের গুরুতর অবনতি ঘটে মহারাজার। আর এর পর থেকে ইংরেজরা তাঁর পতন ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে বিশেষভাবে।

নানা বিষয়ে দুর্বলতা ছিল মহারাজার, তবে মেয়েদের প্রতি ছিল বেশি। অমৃতসর থেকে মমতাজ বেগম নামের এক সুন্দরী ও কুশলী নাচওয়ালিকে তিনি এনেছিলেন ইনদোরের প্রাসাদে। তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করতেন মহারাজা, সে আকর্ষণ এক সময় গভীর প্রেমে পরিণত হয়। মমতাজের কিন্তু কোনও দুর্বলতা ছিল না মহারাজার প্রতি। কয়েক বার সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কড়া পাহারার জন্যে ব্যর্থ হয়েছে প্রতিবারই।

তবে মহারাজা যখন হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য শহর মুসউরি যাচ্ছিলেন বিশেষ ট্রেনযোগে তখন দিল্লিতে মমতাজ তার কামরা থেকে পালিয়ে যায় কৌশলে। দিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ আত্মীয়রা এ ব্যাপারে সাহায্য করে তাকে। তাদের সঙ্গে সে চলে যায় অমৃতসর। পালানোর সময় প্রহরীদের ঘুস দেয়া হয়েছিল। পরদিন দেরাদুনে যখন ট্রেন থামে তখন পলায়নের খবর জানতে পারেন মহারাজা। রেগে একেবারে আগুন হয়ে যান তিনি। কয়েকজন প্রহরীকে সঙ্গে-সঙ্গে বরখাস্ত করা হয়, কয়েকজনকে পাঠানো হয় কারাগারে। মুসউরি না গিয়ে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহারাজা ফিরে আসেন ইনদোর-এ।

কিছুদিন পর মমতাজকে নিয়ে তার মা যান মুম্বই-এ। সেখানে মেয়র বাওলা'র সঙ্গে পরিচয় হয় তাদের। সুন্দরী মমতাজের প্রতি বাওলা আকৃষ্ট হন এবং তাকে রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করেন। এ-খবর পেয়ে মহারাজার সভাসদরা ভাবে : মহারাজাকে খুশি করে মূল্যবান উপহার-সামগ্রী পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো মমতাজকে জোর করে ধরে ইনদোর-এ নিয়ে আসা।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মমতাজকে নিয়ে বাওলা বেড়াতে যেতেন ঝুলন্ত উদ্যানে। মহারাজার সভাসদরা এ-তথ্য পেয়ে হাজির হয় যথাস্থানে। একদিন উদ্যানের আশপাশে দেখা যায় ইনদোর সরকারের কয়েকটি মোটরগাড়ি। ওই সরকারের ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ সহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাও যোগ দেয় অভিযানে। বাওলা'র গাড়ি থামিয়ে মমতাজকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা। কিন্তু বাওলার কাছে রিভলবার ছিল, তিনি গুলি ছোড়েন। তখন আত্মক্ষার জন্য সভাসদরাও পালটা গুলি ছোড়ে। এতে নিহত হন বাওলা। মমতাজকে যখন গাড়িতে তোলা হচ্ছিল তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর দু'জন অফিসার। তাঁরা এসেছিলেন বেড়াতে, গোলাগুলির শব্দ পেয়ে ছুটে যান সেখানে, তারপর হাতেনাতে ধরে ফেলেন ইনদোর সরকারের পুলিশ ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে।

এইভাবে উদ্ধত মহারাজাকে শাস্তি দেয়ার এক মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায় ব্রিটিশরা। বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে তারা মহারাজাকে বলে—হয় সিংহাসন ত্যাগ করো, নয় বিচারের সম্মুখীন হও।

মন্ত্রী ও অমাত্যদের সঙ্গে সলাপরাপর্শ করে মহারাজা বুঝলেন—তাঁকে হত্যা-মামলার আসামি বানিয়ে নানাভাবে বিড়ম্বিত করা হবে, তার চেয়ে পুত্র যশবন্ত রাও হোলকার-এর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করাই ভাল। ওদিকে ইংরেজ প্রতিনিধি (রেসিডেন্ট) স্যার রেজিনাল্ড গ্ল্যানসি'র সুদৃষ্টি পাওয়ার আশায় ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ রাজসাক্ষী হয়ে বসেন।

এরপর স্যার গ্ল্যানসি যে-কূটনীতি চালান তা সম্ভব ছিল কেবল ব্রিটিশদের পক্ষেই। ভাইসরয় তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মহারাজার সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্রে তাঁর স্বাক্ষর নিতে। প্রথা অনুযায়ী সকল ধরনের সৌজন্য ও আনুষ্ঠানিকতা সহকারে স্যার গ্ল্যানসিকে অভ্যর্থনা জানান মহারাজা। মহারাজার সঙ্গে করমর্দন করে তিনি ড্রইংরুমের বিশেষ আসনে বসেন মহারাজার পাশে, তারপর ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ কর্তৃক প্রণীত খসড়া পদত্যাগপত্রটি বের করে স্বাক্ষর দিতে বলেন তাঁকে। বিষণ্ন গম্ভীর মহারাজা তখন স্বাক্ষর করেন ওই পদত্যাগপত্রে। স্বাক্ষরের পর স্যার গ্ল্যানসি কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন—শিশুদের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বেরিয়ে যান প্রাসাদ থেকে।

কিন্তু বেরিয়ে এসেই দেখেন মহারাজার পতাকা পতপত করে উড়ছে প্রাসাদশীর্ষে। সঙ্গে-সঙ্গে চোখের পানি মুছে ফেলে কর্তব্যরত সেনা-সহকারীকে তিনি নির্দেশ দেন পতাকা নামিয়ে ফেলতে। মহারাজাকে আরও লাঞ্ছিত করার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত ধনরত্ন, তহবিল ও সম্পদ-সামগ্রী হস্তান্তর-অযোগ্য ঘোষণা করেন তিনি। মহারাজার পুত্র যশবন্ত সিং জি রাও-এর সঙ্গে ভাইসরয় ও ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সম্পর্ক ছিল প্রীতিপূর্ণ। ফলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিবাদ বেধে যাওয়ার মতো এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু উপায় কি? সাবেক শাসক বেচারা তুকো জি রাও-এর পুত্রের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না আর।

ন্যানসি মিলার-কে বিয়ে করার পর বিশেষ পরিবর্তন আসে মহারাজার জীবনে। মারকিন মহিলা ন্যানসি ছিলেন অসামান্য সুন্দরী, সেইসঙ্গে দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী। আত্মীয়স্বজনরা তাঁর প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। ন্যানসির কারণেই মহারাজা তাঁর নির্বাসিত জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটাতে পারেন শেষ পর্যন্ত। মানেকবাগ প্রসাদ থেকে দেড় মাইল দূরে এক ভবনে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাস করতেন মহারাজা। তাঁর কয়েকজন পুত্রকন্যার বিয়ে হয়েছিল সাবেক মহারাজাদের পুত্রকন্যাদের সঙ্গেই।

যদিও শাসক ছিলেন না তবুও নিজস্ব এক দরবার তাঁর ছিল, যথেষ্ট মর্যাদা ও শান-শওকতের সঙ্গে জীবনযাপন করে গিয়েছেন তিনি। তাঁর চোখের দিকে তাকালে বোঝা যেতো পূর্বপুরুষ শিবজি রাও-এর আত্মিক শক্তিতে তিনি আলোকিত করে রেখেছেন হৃদয়কে ।

ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল পরেও। কারণ ছিল আলোয়ার-এর মহারাজা জে সিং-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। জে সিং ছিলেন ক্ষ্যাপাটে ও ক্রূর প্রকৃতির মানুষ। কড়া ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন, বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা নিয়ে ভাইসরয় ও ইংরেজ প্রতিনিধিকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ শাসনের এমন এক প্রকাশ্য বিরোধীর সঙ্গে তুকো জি রাও-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সন্দিহান করে তুলেছিল ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের।

প্রাসাদে এক ক্লিওপেটরা

ফ্রান্সের রাজধানী পারি-তে বসবাসকারী ধনকুবের ব্যবসায়ী রেজিনাল্ড ফোর্ড-এর তত্ত্বাবধানে ছোটবেলা থেকেই লালিত পালিত হয়ে লেখাপড়া শিখেছে ফরাসি বংশোদ্ভূত জারমেন পেলেগ্রিনো। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জারমেন অবকাশ কাটাতে গিয়েছিল কান-এ—দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরায়। কপুরথালা রাজ্যের হিজ হাইনেস মহারাজা জগজিৎ সিং প্রতি বছরের মতো সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ কারণে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য ধনাঢ্য ব্যক্তি, চিত্রতারকা, প্রেসিডেন্ট ও রাজা-বাদশা নিয়মিত ভিড় জমান কান-এ—সমুদ্রে জলকেলি, সূর্যস্নান ও আমোদ-প্রমোদের জন্য। ওই সময় শহরের রাস্তা-বাজার ভরে যায় সংক্ষিপ্ত স্বচ্ছ স্নানের পোশাক ও রঙিন পায়জামা পরা নরনারীতে। বস্তুত বিলাসবহুল অবকাশকেন্দ্র হিসেবে কান সারা বিশ্বে সুপরিচিত। সেখানে আছে অনেকগুলো ক্যাসিনো, অভিজাত হোটেল ও ক্লাব। সুদীর্ঘ ও সুশোভিত সৈকত জুড়ে স্বল্প পোশাক পরা সুন্দরী স্নানার্থীদের আনাগোনা সত্যিই নয়ন ভরে দেখার মতো এক অপরূপ দৃশ্য। এই সুন্দরীদের অনেকেই শুধুমাত্র দেহের মধ্যভাগ সিল্কের লেসে আবৃত করে ঘুরে বেড়ান নগ্নতাবিরোধী আইনের কারণে।

সমুদ্রের তীর ধরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর 'কতুরিয়ের' নামের এক পোশাক-নির্মাতার দোকানে যান মহারাজা। সেখানে সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী এক যুবতীকে দেখা যায় একজন সেলস গার্লের সঙ্গে কথা বলতে। তার গায়ের রঙ গজদন্তের মতো, আর নাকটা হুবহু দেখতে ক্লিওপেট্রার সেই বিখ্যাত সুগঠিত নাকের মতো। মহারাজা তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে তাকান যুবতীর দিকে, তারপর চোখ টিপেন সঙ্গী দিওয়ান জারমানি দাস-কে। পরবর্তীকালে এক বিবরণীতে দিওয়ান লিখেছেন—

জারমেন আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, অবশ্য আমাদের ফিসফিস কথাবার্তা তার কানে যাচ্ছিল ঠিকই। মহারাজা জানান, এই অপূর্ব রূপসীর সান্নিধ্য পেলে তিনি অত্যন্ত সুখী হবেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি যান দোকানের মালিক জিনিন দুজোঁ'র কাছে। ওই যুবতীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানান তাঁকে। মহারাজাকে ভালভাবেই চিনতেন মাদাম। তিনি তাঁকে 'ভত্রে মাজেস্তে' বলে সম্বোধন করতেন, কারণ কান-এ মহারাজা পরিচিত ছিলেন রাজ্য-অধিপতি হিসেবে। মাদাম বলেন, 'আপনার সম্মানে নিশ্চয়ই তা করবো।'

ফরাসি ভাষায় কিছুক্ষণ আলাপ হয় জারমেনের সঙ্গে। তাতে আমিও যোগ দিই।

পরে মহারাজা বলেন, "আমি আছি হোটেল নিগ্রেকোতে। আসুন না কাল বিকেল পাঁচটায়—এক সঙ্গে চা খাবো।" শুনে জারমেন তাকায় মাদাম দুজোঁর দিকে। তিনি ঘাড় নেড়ে হিজ ম্যাজেস্টির আমন্ত্রণ গ্রহণের ইঙ্গিত দেন তাকে।

পরদিন ঠিক পাঁচটায় হোটেলে এসে হাজির হয় জারমেন। মহারাজা নিজে অভ্যর্থনা জানান তাকে। সে জানায়, তার নাম জারমেন পেলেগ্রিনো। এক ভাই আর মা আছে তার। রেজিনাল্ড ফোর্ডের সে বাগ্‌দত্তা। তিনি তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করেছেন, যাতে তাঁর বিশাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাজে সঙ্গী হিসেবে সে সহায়তা করতে পারে।

বেশ কয়েকবার দেখা-সাক্ষাতের পর জারমেন ও মহারাজার মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব। সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে মত বিনিময় করেন তাঁরা। এসব আলোচনা থেকে মহারাজা বুঝতে পারেন—বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাদীক্ষায় জারমেন বয়সের তুলনায় অনেক প্রাজ্ঞ।

এক সন্ধ্যায়, হোটেলের প্রাঙ্গণে বসে আলোচনাকালে, জারমেনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান মহারাজা। এ-আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই উৎফুল্ল হয় জারমেন, কারণ ভারত তার স্বপ্নরাজ্য। সে বলে, ইয়োর ম্যাজেস্টি, রেজি—রেজিনাল্ড ফোর্ড আপত্তি না জানালে এ আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করবো। কয়েক দিন পর এসে মহারাজাকে সে জানায় : রেজির কোনও আপত্তি নেই, কারণ উন্নত সংস্কৃতির আকর এক প্রাচীন দেশে ভ্রমণের মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতা অনেক সমৃদ্ধ হবে। তবে সে একই সঙ্গে মহারাজাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আমাকে বিদেশী কোনও খেলনার মতো সেখানে তুলে ধরবেন না। আমি যেন কোনও কৌতূহলের সামগ্রী না হই।" মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মহারাজা আশ্বস্ত করেন তাকে।

মহারাজা, আমি ও অন্যান্য কর্মচারী দেশে ফিরে আসি অকটোবর মাসে। জারমেন আসে দু'সপ্তাহ পর। জলন্ধর থেকে সুন্দরী বিদেশিনীকে সে যখন কপুরথালায় পৌঁছায় তখন প্রাসাদের প্রধান ফটকে এক জমকালো অভ্যর্থনা জানানো হয় তাকে। সকল রাজকুমার ও রাজকুমারী এবং প্রধানমন্ত্রী স্যার আবদুল হামিদ ও অন্যান্য মন্ত্রী সহ মহারাজা নিজে উপস্থিত থেকে বরণ করে নেন সুন্দরী বিদেশিনীকে। প্রাসাদ থেকে প্রধান ফটক পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে তখন সৈন্যরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, আর ফরাসি অতিথির সামনে মার্শাল-এর পরিচালনায় ব্যান্ডে বাজানো হচ্ছিল মার্সেই (ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত)। ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সময়কার রীতিতে সাজানো ড্রইংরুমে জারমেনকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এ উপলক্ষে আগত অন্যান্য অতিথির সঙ্গে। তারপর মহারাজা নিজে তাকে পৌঁছে দেন প্রাসাদের এক বিলাসবহুল কক্ষে। ওই কক্ষেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার থাকা-খাওয়ার। প্রাসাদের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ওই কক্ষটি সাধারণত সংরক্ষিত থাকতো মহারাজার প্রিয় মহারানী ও রাজকুমারীদের জন্য। এর উত্তর ও পূর্ব দিক জুড়ে বিশাল উদ্যান—সেখানে ঘুরে বেড়ায় দেশ-বিদেশ থেকে আনা বিরল জাতের অসংখ্য পাখি। ওই রাতেই ব্যাংকোয়েট হলে জারমেন পেলেগ্রিনোর সম্মানে দেয়া হয় এক রাষ্ট্রীয়

ভোজসভা। রাজধানীর অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন সেখানে। স্বাস্থ্যপান করা হয় শ্যাম্পেন (বিয়েনফ্রাপ) দিয়ে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির সঙ্গে বারবার মধুর দৃষ্টি-বিনিময় করেন মহারাজা। খুব হাসিখুশি ও মাতোয়ারা দেখায় তাঁকে ।

জারমেনের বুদ্ধিমত্তা ও দ্রুত অনুধাবন-ক্ষমতায় মুগ্ধ হন মহারাজা। প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ড্রইংরুমে বসে সে যখন রাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতো তখন বোঝা যেতো তার জ্ঞান কত প্রখর। প্রাসাদে সে ছিল এক বছর, কিন্তু এর মধ্যেই প্রাসাদের ভেতরকার ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্র প্রশাসনের নানা কূটকৌশল সে বুঝে নিয়েছিল ভালভাবে। সরকারি রাজনীতিতে বিশেষ আগ্রহ ছিল তার, তাই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তার মতামত জেনে নিতেন মহারাজা। আমি তখন ছিলাম দরবার-মন্ত্রী, পদ ও মর্যাদায় আমার স্থান ছিল প্রধানমন্ত্রী স্যার আবদুল হামিদের পরেই। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্য ছিল। তবে আমার মতামতের প্রতি সাধারণত সমর্থন জানাতো জারমেন।

এভাবে আমরা দু'জনে মিলে মহারাজার মন-মানসিকতা বদলে দিয়েছিলাম অনেকখানি। এতে একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়েন আবদুল হামিদ। কার্যত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাই আমি । ফলে আবদুল হামিদ ও মহারাজার তৃতীয় পুত্র কুমার অমরজিৎ সিং ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন খুব। এই কুমার সবসময় সমর্থন করতেন আবদুল হামিদকে। তাঁর সঙ্গে মিলে তিনি চক্রান্ত শুরু করেন কিভাবে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে দরবার-মন্ত্রীর পদটি গ্রহণ করতে পারেন কুমার নিজে।

কয়েক মাস পর, চেম্বার অব প্রিন্সেস-এর চ্যান্সেলরের সুপারিশে দেশীয় রাজ্যগুলোর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হই আমি, তারপর ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে লন্ডনে যাই। ওই সুযোগে আমার বিরুদ্ধে আবদুল হামিদ ও অমরজিৎ সিং বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন, কিন্তু জারমেনের হস্তক্ষেপে ভণ্ডুল হয়ে যায় সেগুলো।

গোলটেবিল বৈঠকে আমার বক্তৃতাগুলো মহাত্মা গান্ধী ও প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক প্রশংসিত হয়। ম্যাকডোনাল্ড একটা চিরকুটে লিখে পাঠান—"আপনার বক্তব্যের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই।" চেম্বার অব প্রিন্সেস-এর চ্যান্সেলর, সেই সঙ্গে দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রতিনিধি, বিশেষ করে স্যার তেজ বাহাদুর সপরু ও এম আর জয়াকর, আমার সাফল্যের সংবাদ টেলিগ্রাম করে জানান মহারাজাকে। কপুরথালা ফিরে আসার পর আমার সম্মানে মহারাজা এক ভোজসভার আয়োজন করেন, আর উপহার হিসেবে দান করেন তাঁর রাজকীয় রেলওয়ে সেলুনটি। এই সেলুন তিনি কিনেছিলেন তিন লাখ রুপি দিয়ে। নয়া দিল্লির নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশনের কাছে সেলুনটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।

ভোজসভার শেষে আমার কানে ফিসফিসিয়ে মহারাজা বলেন, ভাইসরয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি আমাকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করবেন তিনি। ভোজসভায় খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল জারমেনকে। তার পরনে ছিল সোনার জরি খচিত শাড়ি, স্বচ্ছ গোলাপি

রেশমের ব্লাউজ, হীরা-খচিত ব্রেসলেট ও কানের দুল, আর মুক্তার হার। এগুলো মহারাজা তাঁকে দিয়েছিলেন রাজকোষ থেকে। রুবি ও হীরাখচিত এক টিয়ারা মাথায় পরে জারমেন রাজ্যের ক্ষমতা ও মর্যাদার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে ধীরে ধীরে। এক নির্দেশ জারি করে তাঁকে 'মহান শলাকর' (প্রধান উপদেষ্টা) আখ্যায়িত করেন মহারাজা। ফলে রাজ্যসভার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মাদামোয়াজেল জারমেন পেলেগ্রিনো প্রাসাদের সকল সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকে। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে থাকেন ভারতের ভাইসরয় ও তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের পদস্থ অফিসারগণ এবং তাঁদের স্ত্রীরা, একই সঙ্গে বিভিন্ন রাজপরিবারের সদস্যরাও।

মুখ্যমন্ত্রিত্বের লড়াই অব্যাহত থাকে ওদিকে। পরের গ্রীষ্মে মহারাজা যান ইউরোপে—সঙ্গে মাদমোয়াজেল পেলেগ্রিনো, আমি ও ২০-২২ জন কর্মচারী। প্রথমে যাই পারি, উঠি L' Etoile-র নিকটবর্তী পাঁচতারা হোটেল 'জর্জ ফিফথ'-এ। মাদমোয়াজেল তখন প্রায়ই দেখা করতে থাকে রেজিনাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে। এতে খুবই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন মহারাজা। ব্যাপারটা আর সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি।

এক সকালে Bois de Boulogne ধরে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি আমাকে বলেন, "জারমেনকে বিয়ে করে মহারানী বানাতে পারলে আমি খুব সুখী হবো।" আমি জানতাম জারমেন ও ফোর্ড একে অন্যকে ভালোবাসে এবং শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করবে। তবু মহারাজাকে বলি, "আপনি প্রস্তাব করে দেখতে পারেন।" এরপর মহারাজা আমাকে বলে, "যেহেতু তোমার পরামর্শ সে খুব শোনে তাই দেখো—প্রস্তাবটা যেন আবার প্রত্যাখ্যান না করে বসে।"

জারমেনের সৌন্দর্য, আকর্ষণ, মহিমা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি তাঁর আচ্ছন্নতা বাড়ছিল প্রতিদিনই। এক সন্ধ্যায় জারমেনকে তিনি ডিনারে নিয়ে যান রিজ হোটেলে, সঙ্গে আমিও ছিলাম। কয়েক পাত্র শ্যামপেনের পর তাকে তাঁর মহারানী হওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে যায় জায়মেন, তবে চোখ না তুলে শান্ত কণ্ঠে ফরাসিতে বলে, "তা সম্ভব নয়, মঁসিয়ে! কারণ রেজি আমার ফিঁয়াসে।" শুনে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন মহারাজা। তাড়াতাড়ি ফিরে যান হোটেলে—দুঃখ-যন্ত্রণায় কাটে তাঁর বিনিদ্র রাত। ভোর চারটার দিকে তিনি ফোন করেন আমাকে—বলেন অবিলম্বে দেখা করতে। গিয়ে দেখি ক্ষোভে-দুঃখে তিনি ফুঁসছেন রীতিমতো। ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে বলেন, "হয় তুমি তাকে বিয়েতে রাজি করাও নয় এই আমি আত্মহত্যা করলাম।" তবে জগজিৎ সিংকে বিয়ে করার ব্যাপারে জারমেনকে আমি রাজি করাতে গেলাম না, কারণ আমি জানতাম—এ বিয়ে মোটেও স্থায়ী হবে না, কয়েক মাসের মধ্যেই এর দুঃখজনক সমাপ্তি ঘটবে।

জারমেন ও রেজিনাল্ড ফোর্ডের বিয়ে হয় কিছুদিন পর। বিয়ের জন্য এমন সুন্দরী এক রমণী পেয়েছিলেন—অথচ আমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করালাম না, এজন্য আমাকে আর ক্ষমা করলেন না মহারাজা।

জারমেনের জন্মদিন উপলক্ষে কপুরথালা থেকে মহারাজা এক মহামূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন পারিতে। উপহারটি ছিল ইতিহাসবিখ্যাত এক মুক্তামালা। কিন্তু ওই উপহার

পাঠানোর কয়েক দিন পরই মহারাজা শোনেন জারমেন ও ফোর্ডের বিয়ের খবর। মুক্তামালা পেয়ে জারমেন ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লেখে মহারাজার কাছে : "এটাকে আমি আমার বিয়ের উপহার হিসেবে সাদরে গ্রহণ করছি।"

রহস্যময়ী

আলোয়ার রাজ্যের অধিপতি শ্রী মহারাজা জেয় সিং জি 'ভারত ধরম প্রভাকর', 'রাজঋষি' প্রভৃতি নানা বিচিত্র উপাধিতে নিজেকে ভূষিত করেছিলেন। তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন রাজপুত্র ও সরদারদের জন্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত আজমির কলেজে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনও সহানুভূতি ছিল না তাঁর। জনগণের সমস্যা ও দুঃখকষ্ট সম্পর্কে কিছু জানতেনও না তিনি। মহারাজা হিসেবে তিনি থাকতেন গজদন্ত মিনারে রঙিন স্বপ্নে বিভোর।

অন্যান্য রাজার মতো জেয় সিং-ও সিংহাসনে আরোহণের পরপরই মগ্ন হন ভোগ-বিলাসে। লাখ-লাখ রুপি খরচ করে বিশাল-বিশাল প্রাসাদ বানাতে থাকেন তিনি। ব্যক্তিগত প্রাসাদগুলোতে যাতায়াতের জন্য যেসব পথ তিনি বানান তাতেও ব্যয় করেন প্রচুর অর্থ। ওই পথগুলোতে জনসাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ ছিল—কেবল মহারাজা ও তাঁর অতিথিরা তা ব্যবহার করতেন। এর কোনও-কোনও পথ ১০০ মাইল দীর্ঘও ছিল। ঘন অরণ্যের ভেতর দিয়েও ছিল দু'একটি পথ। ওইসব পথ ধরে অরণ্যে ঢুকে বাঘ, চিতা প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী শিকার করতেন মহারাজা।

বাঘ-শিকারের জন্য রাজধানী থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে গড়া হয়েছিল শিরিষ্ক প্রাসাদ। একটি রাস্তা ওই প্রাসাদ পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছিল—যা কেবল নির্দিষ্ট ছিল মহারাজা ও তাঁর অতিথিদের চলাচলের জন্য। ওই প্রাসাদ ও রাস্তার জন্য রাজকোষ থেকে ব্যয় হয়েছিল এক কোটি রুপিরও বেশি। প্রাসাদের উপযোগিতার একটি বিশেষ দিক ছিল : এর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই বাঘ, চিতা দেখে গুলি করা যেতো। চারদিকে ছিল ঘন বন—অনেক বাঘ ঘুরে বেড়াতো এর আশপাশে। মোটরে করে ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ও অনেক বাঘ ও হিংস্র জন্তু চোখে পড়তো দু'পাশে। তখন মহারাজা ও তাঁর অতিথিরা ছুটতেন সেগুলো শিকার করতে। রাস্তাটি এত মসৃণ ও প্রশস্ত ছিল যে তা ফাসিস্ত একনায়ক মুসোলিনির নির্দেশে নির্মিত রোম-নেপলস মহাসড়কটির কথা মনে করিয়ে দিতো অনেককে।

রাজ্যের বাজেট থেকে, এটা স্পষ্টই বোঝা যেতো যে, গণপূর্ত বিভাগের বেশির ভাগ অর্থই ব্যয় হয়েছে মহারাজার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নির্মিত ওইসব রাস্তার পেছনে। রাজ্যের অন্য সকল রাস্তা ছিল অবহেলিত, চলাচলের অনুপযোগী।

রাজ্যের জন-উপযোগিতা বিভাগের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল একই অবস্থা। মহারাজার ছিল

বিপুল সংখ্যক সভাসদ ও পরিষদ—এদের খরচ চলতো ওই বিভাগের অর্থ দিয়ে। মহারাজা নিজেকে ভাবতেন সূর্য-দেবতার সাক্ষাৎ বংশধর। আলোয়ার রাজ-পরিবারের এক বংশ-লতিকা তিনি বানিয়ে নিয়েছিলেন—তা দিয়ে নিজেকে তিনি সূর্য-দেবতার বংশধর বলে প্রমাণ করতেন। ওই বংশ-লতিকায় দেখানো হয়েছিল যে, তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র—যাঁকে অবতার মনে করে হিন্দুরা। মহারাজা নিজেকেও ভাবতেন একজন অবতার, আর অন্যদেরও তা ভাবতে বাধ্য করতেন।

হাজার-হাজার বছর আগে শ্রীরামচন্দ্র যে-ধরনের পোশাক পরতেন তিনিও তেমন বেশবাস করতেন। সেকালের রীতিতে নির্মিত একটি মুকুটও তাঁর ছিল। সেটা দেখতে ছিল ইংল্যান্ডের রাজার মুকুটের মতো—অবশ্য ক্রুশচিহ্ন ছাড়া। সেকালে অবশ্য ওই ধরনের রত্নখচিত পারসি টুপিও ছিল।

মেয়েদের প্রতি কোনও আগ্রহ ছিল না মহারাজার। বস্তুত কোনও নারীর সঙ্গে তাঁর যৌন-সম্পর্ক ছিল না—কোনও নারীর প্রতি যৌন-আকর্ষণও ছিল না। সারাজীবনই তিনি ছিলেন মেয়েদের থেকে যথাসম্ভব দূরে। তিনি ভালবাসতেন পুরুষসঙ্গ—যদিও অনেক মহারানী তাঁর ছিল, চারবার বিয়েও করেছিলেন।

মন্ত্রী, অমাত্য, সচিব ও দেহরক্ষীদের চাকরি দিতেন তিনি খুব খোঁজখবর নিয়ে ; তবে তাদের দৈহিক দিকটি আকর্ষণীয় কিনা তা লক্ষ্য করতেন আরও বেশি।

অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য। তাঁদের একজন ছিলেন মুঘল-সম্রাটদের বংশধর গজনফর আলি খান। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন ভারতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। মহারাজা তাঁকে রাজস্ব মন্ত্রী বানিয়েছিলেন—প্রাসাদে ও হারেমে অবাধ যাতায়াতের অনুমতিও দিয়েছিলেন তাঁকে।

নারীবিদ্বেষী হলেও মহারাজা রাতের বেলায় আয়োজন করতেন বিশেষ যৌনলীলার। এতে মহারানী ও রক্ষিতারা ছাড়াও তাঁর প্রিয় মন্ত্রী ও অমাত্যরাও অংশ নিতেন। লীলাস্থলে কোনও পার্থক্য করা হতো না মহারানী ও রক্ষিতাদের মধ্যে। আমন্ত্রিত পুরুষরা, সুযোগ পেলে, যে কোনও রমণীর সান্নিধ্যে যেতে পারতেন।

এইসব যৌনলীলায় সবসময় উপস্থিত থাকতেন মহারাজা। তাঁর মহারানী ও রক্ষিতাদের সঙ্গে সভাসদ পারিষদবর্গের খোলাখুলি কামকেলিতে কোনও আপত্তি জানাতেন না তিনি। সারারাত ধরে চলতো মদ্যপান, নাচ, গান আর হৈহল্লা। মাঝেমধ্যে সঙ্গিনীকে নিয়ে অনেকেই চলে যেতো প্রাসাদের নিরিবিলি স্থানে।

হারেমের সব রমণীই বলতে গেলে ছিল গজনফর আলি খানের হাতের মুঠোয়। তাদের একরকম বগলদাবা করেই চলতেন তিনি। প্রাসাদ-কর্মকর্তাদের অনেকেই জানতেন : প্রাসাদ-রমণীদের সঙ্গে অবাধ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে খানকে। এ অনুমতির আওতায় ছিল মন্ত্রী-অমাত্যদের স্ত্রী-কন্যারাও।

তবে মহারাজা ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন খুব। এ জন্য মন্ত্রী-অমাত্যদের স্ত্রী-কন্যাগণকেও তিনি আমন্ত্রণ জানাতেন রাতের আসরে—ওর উদ্দেশ্য ছিল প্রাসাদ-রমণীদের সম্মান বাঁচানো। সকলেই যে একই পথের যাত্রী—এটা দেখাতে চাইতেন তিনি। তাই রানী-

মহারানীদের মতো একই অবস্থায় পড়তে হতো মন্ত্রী-অমাত্যদের স্ত্রী-কন্যাদেরও।

অবশ্য খানের স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের কোনও মহিলা রাতের আসরে আসতেন না কখনও। এ-ব্যাপারে মহারাজার কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন খান। মহারাজাকে তিনি বুঝিয়েছিলেন : "আমি একজন খাঁটি মুসলমান, তাই পবিত্র কোরানের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারি না। এইসব আসরে আমাদের মেয়েদের যোগদান নিষিদ্ধ—কারণ স্বামী ও নিকট আত্মীয় ছাড়া কারও সামনে তারা যেতে পারে না—অন্যদের মুখ বা দেহ দেখানো তাদের জন্য ভয়ঙ্কর পাপ।"

কয়েক বছর কাটে। মহারাজা ও প্রাসাদ-রমণীদের কাছে ইতিমধ্যে আরও প্রিয় হয়ে ওঠেন খান। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী গিরিধারী লাল-এর নেতৃত্বে হিন্দু কর্মকর্তারা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন লালকেল্লায়। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল : কেন গজনফর আলি খান অবাধে প্রাসাদে যাচ্ছেন এবং কেন তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের মেয়েরা বাড়িতে অথবা রাজ্যের বাইরে থাকছেন? চৌধুরী গিরিধারী লাল মোক্ষম যুক্তি দিয়ে হিন্দু কর্মকর্তাদের বোঝান : তোমাদের বউ-ঝিদের সঙ্গে খান অবাধে মিশছে—কিন্তু তার বউ-ঝিদের সঙ্গে তোমাদের মিশতে দিচ্ছে না। এটা কি তোমাদের চরিত্র, মানসম্মান ও মর্যাদার জন্য হানিকর নয়? কর্মকর্তারা বুঝলেন সবকিছু, কিন্তু সাহস পেলেন না মহারাজাকে বলার।

একদিন মহারাজা খুব হাসিখুশি মেজাজে ছিলেন আর রাজকার্যে খান ছিলেন রাজ্যের বাইরে। এই সুযোগে হিন্দু কর্মকর্তাদের পক্ষ হয়ে চৌধুরী গিরিধারী লাল অভিযোগ পেশ করলেন, "মহারাজ, আমাদের মেয়েরা আপনার প্রাসাদে যাচ্ছে—এতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তাদের সঙ্গে আপনি, আপনার প্রাসাদ-কর্মকর্তারা এবং আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম অমাত্যগণ যেভাবে মিশছেন তাতেও আমরা কোনও আপত্তি জানাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের মেয়েদের সঙ্গে খানের সম্পর্ক স্থাপনকে আমরা অনুমোদন দিতে পারি না—কারণ তার মেয়েদের সে প্রাসাদে কখনও আনে না।"

ধৈর্য সহকারে এই বক্তব্য শোনেন মহারাজা। প্রথমে খুব বিরক্ত হন , কিন্তু পরে তাঁর রাগ পড়ে আসে ক্রমশ। শেষে চৌধুরীর বক্তব্যকে সঠিক বলেই মেনে নেন তিনি। সরকারি সফর শেষ করে খান ফিরে আসার পর মহারাজা তাঁকে ডেকে পাঠান। বলেন, "প্রাসাদের আগামী উৎসবে তোমার স্ত্রীকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।" খান ঘাবড়ে যান খুব। প্রথমে তালবাহানা করতে থাকেন, কিন্তু মহারাজার রাগের কথা তাঁর জানা ছিল। নির্দেশ অমান্য করলে তিনি হয়তো তাকে জেলেই ঢুকিয়ে দেবেন। কাঁচমাচু হয়ে খান বলেন, "মাসখানেক পর দিওয়ালি উৎসব—তখন অবশ্যই আমার স্ত্রীকে প্রাসাদে নিয়ে আসবো।" লাহোর থেকে বেগমকে নিয়ে আসার জন্য তিনি এক মাস সময় চাইলেন তাই। মহারাজা সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ১০ হাজার রুপি দিলেন লাহোরে গিয়ে বেগমকে রাজধানীতে নিয়ে আসার জন্য।

রাজধানী থেকে লাহোরে যাওয়ার পথে খান থামেন দিল্লিতে—বন্ধুদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন জে এন সাহ্নি। নিজের দুর্ভাগ্যের বিবরণ

দিয়ে তিনি তাঁদের জানান : রাতের আসরে যোগ দেয়ার ব্যাপারে বেগমকে তিনি কিছুতেই রাজি করাতে পারবেন না—অন্যদিকে বেগমকে না নিয়ে তিনি যদি রাজধানীতে ফেরেন তা হলে মহারাজা তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠাবেন।

বন্ধুরা বলেন, এটা কোনও সমস্যাই নয়। যেহেতু তিনি একজন মুসলমান তাই 'মুতা' অর্থাৎ সাময়িক বিবাহের বৈধ অধিকার তাঁর আছে। ইসলামি আইন অনুযায়ী এ ধরনের বিয়ে বৈধ। কাজেই মহারাজাকে খুশি করতে তাঁর উচিত সুন্দরী কোনও নাচওয়ালি খুঁজে নেয়া। 'মুতা' বিয়েটা কোনও মোল্লা ডেকেও পড়ানো যায়।

হতাশ ও বিষণ্ন খান একথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, বলেন, "আমার প্রাণ বাঁচলো।" বন্ধুদের নিয়ে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে যান নাচওয়ালি ও পতিতাদের পাড়ায়। অনেক খুঁজেপেতে শেষ পর্যন্ত একজনকে তাঁর পছন্দ হয়। মেয়েটি বুদ্ধিমতী; তার চেহারা সুন্দর, স্বাস্থ্যও সুগঠিত। তার মা-বাবার কাছে 'মুতা' বিয়ের প্রস্তাব রাখেন খান। নাম-কা-ওয়াস্তে বিয়ে করে বউ সেজে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে নাচওয়ালি ও পতিতারা সাধারণত তেমন বাছবিচার করে না। সেখানে এমন একজন নামী দামি মানুষ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন! হোক না তা সাময়িক বা স্থায়ী! তারা সানন্দে রাজি হয় বিয়েতে। মেয়েটির মা-বাবাকে বিয়ের উদ্দেশ্য জানানো হয় এক সময়। বলা হয়, খানের নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুযায়ী মেয়েটিকে এক দক্ষতা ও বুদ্ধির খেলা খেলতে হবে। দরদাম ঠিক করা হয়। সে অনুযায়ী অর্ধেক পারিশ্রমিক অগ্রিম দেয়া হয়, কাজশেষে দেয়া হবে বাকি অর্ধেক।

মনোনীত বধূকে খান রাখেন নয়া দিল্লির এক বাড়িতে। সেখানে সপ্তাহখানেক ধরে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাকে। তারপর খান যখন লাহোরে যান তাঁর বেগমের কাছে তখন তাঁর বন্ধুরা মেয়েটিকে কামলীলা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান দেন আরও। তবে এসব ব্যাপারে মেয়েটি যে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল তা নয়।

লাহোর থেকে খান টেলিগ্রাম পাঠান মহারাজার কাছে, তাতে জানান—শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে তিনি বেগম সহ রাজধানীতে ফিরছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে মহারাজা বলেন তাঁর সভাসদদের উদ্দেশে, "আগেই বলেছিলাম—আমার অনুগত মন্ত্রী ঠিকই আমার নির্দেশমতো কাজ করবে!"

টেলিগ্রামের উত্তরে খানের কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠান মহারাজা। তাতে জানান, "নির্ধারিত দিন ও সময়ে পৌঁছলে তাঁকে ও তাঁর বেগমকে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনা দেয়া হবে।"

লাহোর থেকে দিল্লি এসে বন্ধুদের বাড়ি থেকে তাঁর 'বেগম'কে নিয়ে সোজা ট্রেনে চাপেন খান। নিজের ও বেগমের জন্য দু'টি প্রথম শ্রেণীর এবং কর্মচারীদের জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করেছিলেন তিনি। মন্ত্রী, কর্মকর্তা ও সভাসদ সহ মহারাজা রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা জানান খান ও আপাদমস্তক গোলাপি সিল্কের বোরখায় আবৃত তাঁর বেগমকে। রীতিমতো গার্ড অব অনার দেয়া হয় খানকে।

একসময় খানকে বুকে জড়িয়ে ধরেন মহারাজা, তাঁর গালে চুমু খান। বেগম ও তাঁর সহচরীরা এক পরদা-ঢাকা মোটরগাড়িতে চড়ে যান খানের বাড়িতে। ওই গাড়িটা ট্রেনের

প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে বেঁধে আনা হয়েছিল। বাড়িতে ফিরে খান তাঁর বেগমকে বারবার করে আদব-কায়দা শেখাতে থাকেন। বলেন : খুব সাবধান! চালচলনে যেন একটুও ভুলচুক না হয়।

ওদিক মহারাজা, তাঁর হিন্দু মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা মনে-মনে খুব খুশি : রাতের আসরে তো বেগম আসছেনই! একমাত্র মহারাজা ছাড়া আর সবাই ভাবছিলেন : এবার খান, তুমি যাবে কোথায়? আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের সঙ্গে তুমি যা করেছো এবার তার বদলা নেবো!

প্রথা অনুযায়ী উৎসবে আমন্ত্রিত মহিলারা প্রাসাদে ঢুকতেন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ফটক দিয়ে। মহারানীদের সহচরীরা সেই পথ দিয়ে বেগম খানকে নিয়ে যায় প্রাসাদের অভ্যন্তরে, আর প্রধান ফটক দিয়ে প্রাসাদে ঢোকেন খান—যোগ দেন আসরে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে। মহারাজা যাদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না সেই ইংরেজ ও দেশী কর্মকর্তাদের এসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হতো না।

আসরের শুরু থেকেই পরিবেশন করা হয় খাদ্য ও পানীয়। মহিলারা এক দিকে এবং পুরুষরা অন্য দিকে গুলজার করেন আসর। পানীয়ের প্রভাবে স্ফূর্তির মাত্রা বেড়ে গেলে আর কোনও দূরত্ব রাখতেন না তাঁরা মাঝখানে। তখন সমবেত কামলীলা শুরু হতো পূর্ণোদ্যমে।

বেগমকে ভালভাবেই সব শিখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন খান। তবে তিনি এমন এক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন যে এসব প্রশিক্ষণের কোনও দরকারই ছিল না। এ-ধরনের আসরে যোগ দিতে পেরে তিনি খুশি হয়েছিলেন সকলের চেয়ে বেশি। একের পর এক পুরুষকে তিনি যেভাবে সুখানন্দের চূড়ায় পৌঁছে দিচ্ছিলেন তাতে ভোর হওয়ার আগেই সকল পুরুষ পরিণত হয়েছিল তাঁর মুগ্ধ প্রণয়ীতে।

হারেম ও দরবারের অন্য মহিলাদের সঙ্গে খান নিরবচ্ছিন্ন লীলায় মগ্ন থাকলেও বেগমের কাজকর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। মনে-মনে তিনি হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন, ভাবছিলেন—দিল্লির বন্ধুরা তাঁকে বাঁচাতে কি অপূর্ব যন্ত্রই না আবিষ্কার করেছে! সকালের দিকে আসর ভাঙলে বেগমকে নিয়ে খান চলে যান দ্রুত।

খানের সৌজন্যে অশেষ প্রীত হয়ে মহারাজা পরদিন সকালেই বেগমকে পঞ্চাশ হাজার রুপি উপহার পাঠান—মুম্বই ও কলকাতার সেরা দোকান থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ অলঙ্কারপত্র কেনার জন্য।

খানের অনুরোধে বেগমকে কলকাতা ও মুম্বই-ও যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। বলা হয় : আগামী উৎসবের জন্য সেখানে তিনি প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করবেন। রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন খান।

কলকাতায় গিয়ে আরেক খেলা খেলেন তিনি, যার রহস্য মহারাজার জীবিতকালে আর কেউ জানতে পারে নি। সেখান থেকে খান এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে মহারাজাকে জানান, তার স্ত্রী অ্যাপেনডিসাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন—তাই রাজধানীতে ফিরতে দেরি হবে। কয়েক দিন পর আরেকটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে খান জানান, অস্ত্রোপচার সফল হয় নি—ফলে বেগম মৃত্যুবরণ করেছেন। মহারাজা তখন গভীর শোক প্রকাশ করে চিঠি ও

টেলিগ্রাম পাঠান খানের কাছে। বস্তুত এই মৃত্যুতে মহারাজা ও তাঁর সভাসদরা খুবই মর্মাহত হন। তাঁরা বিশেষভাবে স্মরণ করেন সেই রাতের আসরের মত্ত প্রহরগুলোর কথা—যখন সুন্দরী বেগম তাঁদের তৃপ্ত করেছিলেন কত অমূল্য উপহার দিয়ে! দেহ-মনে অমন উন্মোচনের স্মৃতি কি কেউ ভুলতে পারে কখনও?

রাজকুমারী

কপুরথালার মহারাজা নিহাল সিংয়ের কন্যা রাজকুমারী গোবিন্দ কাউর বড় হয়েছেন বিলাস-বৈভবের মধ্যে। তাঁর সহোদর ভাই ছিলেন হিজ হাইনেস মহারাজা রণধীর সিং। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন রাজকুমারী অমৃত কাউর—তাঁর পিতা রাজা স্যার হরনাম সিং ছিলেন গোবিন্দ কাউরের ভ্রাতুষ্পুত্র।

এক সম্ভ্রান্ত ধনবান ও প্রতাপশালী ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছির রাজকুমারী গোবিন্দ কাউরের। বিয়ের সময় তিনি শর্ত দিয়েছিলেন—স্বামীর সঙ্গে কেবল কপুরথালায়ই থাকবেন, কখনওই ১০ মাইল দূরের ছোট্ট শহর করতারপুরে স্বামী-গৃহে যাবেন না। স্বামী এতে রাজি হন, আর মহারাজা তখন কন্যা ও জামাতার বসবাসের ব্যবস্থা করেন 'জালাও খানা' (রাজপ্রাসাদ)-র নিকটবর্তী এক প্রাসাদে।

ওই প্রাসাদটি ছিল প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত একটি ছয়তলা ভবন—যার নির্মাণকাজে ব্যবহৃত হয়েছিল ছোট-ছোট ইট, কাঠের তক্তা-ফালি ও কংক্রিট। এর ফটক ছিল মাত্র একটি, প্রাসাদে প্রবেশ করতে হলে ওই ফটক ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সেখানে ছিল কড়া পাহারার ব্যবস্থা। 'দেউড়ি' (প্রবেশ-কক্ষ)-র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে সশস্ত্র প্রহরীরা ভেতরে ঢুকতে দিতো না কাউকে।

প্রাসাদের আসবাবপত্র সবই ছিল প্রাচ্য রীতিতে নির্মিত। বিশেষভাবে সুসজ্জিত একটি অংশ ছিল প্রাসাদের—যাকে বলা হতো 'শাহ নিশিন' (রাজকীয় ব্যালকনি)। আগে ওখানে দাঁড়িয়েই প্রতিদিন সকালে জনসাধারণকে দেখা দিতেন মহারাজা। পরে রাজকুমারী ওখানে বসেই কাটাতেন বেশির ভাগ সময়—লোকজনের যাতায়াত দেখতেন মনোযোগ দিয়ে। 'শাহ নিশিন' এমনভাবে পরদাঢাকা ছিল যে সেখান থেকে রাজকুমারী বাইরে সবাইকে দেখতে পেতেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পেতো না বাইরের কেউই। প্রাসাদে বড়-বড় ড্রইং, ডাইনিং ও বেডরুম ছিল, আর পানি তোলার জন্য ছিল একটি ইঁদারা।

রাজকুমারী ছিলেন অত্যন্ত কামুক—যৌনমিলনের ক্ষেত্রে প্রায় বাছবিচারহীন। স্বামীকে দিয়ে তাঁর যৌনতৃপ্তি হতো না। স্বামী ছিলেন কুৎসিত, অশিক্ষিত, দুর্বল ও নির্বোধ। মানসিক ও শারীরিকভাবে পঙ্গু ছিলেন তিনি—নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে নানা দুরাচার করতেন দুর্বৃত্তের মতো। নানা ছল-ছুতায় রাজকুমারী প্রাসাদে নিয়ে আসতেন সুগঠিত দেহের সুদর্শন যুবক ও অন্যদের—তাদের শয্যাসঙ্গী করতেন অবলীলায়। ফটকে কর্তব্যরত সশস্ত্র প্রহরীদের দিয়েও নিজের অদম্য যৌন লালসা মেটাতেন তিনি।

উৎকামুকতায় গোবিন্দ কাউর মিশরের ক্লিওপেটরা বা রাশিয়ার ক্যাথারিন দ্য গ্রেট-এর চেয়ে কম ছিলেন না কোনও অংশে। তাঁর স্বামী সবই জানতেন, কিন্তু ভান করতেন না-জানার—আসলে তিনি মেনে নিয়েছিলেন নিজের ভাগ্যকে। পরে প্রাসাদের বাইরে 'বারাদারি' (১২ দরজাবিশিষ্ট ঘর) নামের এক বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন তিনি। মাঝেমধ্যে স্ত্রীকে দেখতে যেতেন, তবে ইতি ঘটেছিল দু'জনের দাম্পত্য সম্পর্কে।

কপুরথালা রাজ্য সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিজ একসেলেন্সি নওয়াব গুলাম জিলানি ওই প্রাসাদের নিকটবর্তী 'দিওয়ান খানা' (প্রধানমন্ত্রীর ভবন) প্রাসাদে মন্ত্রিসভার বৈঠক করতেন, সেখানেই কাটাতেন বেশির ভাগ সময়। তবে তিনি থাকতেন 'দিওয়ান খানা' থেকে মাইলখানেক দূরে এক ভবনে—যার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব একটি হারেমও ছিল।

গুলাম জিলানি ছিলেন দীর্ঘদেহী সুদর্শন পুরুষ। মাথায় পরতেন একটা গোল সোনার টুপি—দেখতে তা অনেকটা ছিল ইংল্যান্ডের রত্নখচিত রাজমুকুটের মতো। মুখের দাড়ি তিনি ছেঁটে রাখতেন—পরতেন ঢিলা আচকান ও সিল্কের পায়জামা। দেখলে মনে হতো দন হুয়ান। রাজকুমারীর রূপের খবর তিনি পেয়েছিলেন, একদিন দিওয়ান খানা থেকে তাঁকে দেখলেনও—রাজকুমারী তখন প্রাসাদের ছাদে উঠে চুল শুকাচ্ছিলেন রোদে। প্রথম দর্শনেই তাঁর প্রেমে পড়লেন তিনি।

রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক কৌশলই অবলম্বন করলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু ব্যাপারটা সহজ ছিল না মোটেও। রাজপ্রাসাদে—বিশেষ করে যেসব প্রাসাদে রাজকুমারীরা থাকেন সেখানে যাতায়াতের নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ ছিল খুবই কড়া।

প্রাসাদ-কর্মচারী ও ফটক-প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে রাজকুমারীর প্রাসাদে ঢোকা সম্ভব ছিল না কারও পক্ষে। রাজকুমারী প্রতিদিন দুই ঘোড়ায় টানা এক কোচে করে বাইরে যেতেন বেড়াতে। কিন্তু তিনি তখন এত পরদাঢাকা থাকতেন যে কর্মচারী ও প্রহরীরা তাঁর চেহারা বা দেহ দেখতে পেতো না। বিশাল এক চলন্ত পরদার ভেতর হেঁটে-হেঁটে তিনি দেউড়ি থেকে কোচে উঠতেন—ফলে তাঁকে কেউ দেখবে এমন সুযোগ ছিল না। রাজকুমারীর এভাবে বাইরে যাতায়াত গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষও করতেন প্রধানমন্ত্রী। দিনের পর দিন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের কথা ভেবে একেবারে আবিষ্ট হয়ে যেতে থাকেন তিনি।

'দিওয়ান খানা'য় ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি প্রশস্ত কামরা ছিল গুলাম জিলানির। সেখানে রাত কাটাতেও থাকেন তিনি। অথচ প্রধান মন্ত্রীরা সাধারণত ওই প্রাসাদটি ব্যবহার করতেন মন্ত্রিসভার বৈঠক ও দাফতরিক কাজকর্মের জন্য। 'দিওয়ান খানা' কখনওই ব্যবহৃত হয় নি আবাসস্থল হিসেবে। এ ছাড়া গুলাম জিলানি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটানোর জন্য রাজধানী থেকে ১২ মাইল দূরে জলন্ধরে যেতেন। দূরত্ব মাত্র ১২ মাইল হলেও ঘোড়ায় টানা কোচে করে যেতে সময় লাগতো দু'ঘণ্টা। দু'তিন জায়গায় ঘোড়া বদল করে যাত্রা ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থাও ছিল। প্রধানমন্ত্রী একদিন রাজকুমারীর কাছে দেখা করার অনুমতি চেয়ে বার্তা পাঠালেন তাঁর দাসী মওলো'র মাধ্যমে। এজন্য প্রচুর পারিতোষিক দিতে হয়েছিল তাকে। রাজকুমারী রাজি হলেন, কিন্তু

মুশকিল বাধলো সাক্ষাতের ব্যবস্থা নিয়ে।

পরে গোবিন্দ কাউরের প্রাসাদে পৌঁছার জন্য এক সুড়ঙ্গপথ খনন করা হলো। ওই পথে আসা-যাওয়া করে তাঁরা প্রায়ই একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হতেন। কিন্তু এই স্বল্পকালীন মিলনে খুশি হতে পারেন না গুলাম জিলানি। তিনি চাইলেন রাজকুমারীকে জলন্ধরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে—সেখানে অনেক বেশি সময় কাটাতে পারবেন তাঁরা একত্রে, সেখানে নিয়মকানুন ভয়ভীতির কোনও বালাই থাকবে না—মধুর অবসর যাপনের মতো করে আনন্দময় করে তোলা যাবে সবকিছু। শেষে এক উপায়ও বাতলে ফেলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি টানতো দুই ঘোড়ায়। কোচের আসনের সামনে থাকতো ভেলভেটের পরদা ও একজন কোচোয়ান, আর কোচের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতো দু'জন সহিস। তাদের পরনে থাকতো সোনা ও রুপার বোতামঅলা ইউনিফর্ম, মাথায় থাকতো সোনার ফিতায় মোড়া সিল্কের পাগড়ি। কোচটি ছিল ল্যানডো ধরনের—ইচ্ছামতো খোলা বা বন্ধ করা যেতো। একই ধরনের কোচ রাজকুমারীও ব্যবহার করতেন, তবে তাঁর ঘোড়াগুলোর আবরণ ছিল মূল্যবান রত্নে অলঙ্কৃত। আর প্রধানমন্ত্রীর ঘোড়াগুলোর জন্য নির্ধারিত আবরণ ছিল রুপা ও সাধারণ রত্নে খচিত। কোচের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়—সামনের ও পেছনের আসনের মাঝখানে নিচে থাকতো একটি বাক্স—তাতে রাখা হতো ঘোড়ার খাবার। বিরতিস্থলে গাড়ি থামলে ঘোড়াকে খাবার দেয়া হতো ওই বাক্স খুলে।

প্রধানমন্ত্রী ও রাজকুমারী অনেক যুক্তি-পরামর্শ করে ঠিক করেন : নির্ধারিত দিনে প্রধানমন্ত্রীর কোচে করে রাজকুমারী যাবেন জলন্ধরে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ঝাড়ুদারনি সেজে ও ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাজকুমারী বেরিয়ে পড়েন প্রাসাদ থেকে, তারপর লুকিয়ে থাকেন কোচের সেই বাক্সের মধ্যে। তার আগে অবশ্য তাঁকে বাক্স থেকে ঘোড়ার খাবার বের করে ফেলে দিতে হয়, সন্দেহ এড়ানোর জন্য জায়গাটা ঝাড়ু দিয়ে সাফও করতে হয়। বাক্সের মধ্যে রাজকুমারীকে বসে থাকতে হয় প্রায় তিন ঘণ্টা, কারণ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মহারাজার পাঠানো কিছু সরকারি কাজ সারতে দেরি হয়ে যায় প্রধানমন্ত্রীর।

কোচ যথারীতি যাত্রা করে জলন্ধরের পথে। প্রধান সড়ক পেরিয়ে শহরের বাইরে পৌঁছতেই বাক্সের ডালা খুলে রাজকুমারীকে বের করে আনেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর একে অন্যকে তাঁরা বাঁধেন গভীর আলিঙ্গনে, ঠোঁটে ঠোঁট মিশিয়ে আকণ্ঠ পান করতে থাকেন প্রণয়সুধা। গাড়িতে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণখচিত রুপার হুঁকা ছিল, তাতে লখনউ'র সুগন্ধি তামাক পুরে দু'জনে ধূমপানও করেন সুখানন্দে।

জলন্ধরের পথে এই দু'ঘণ্টা, রাজকুমারীর সাহচর্যে, প্রাণভরে উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে পৌঁছে বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর জন্য সংরক্ষিত এক বাড়িতে ওঠেন তাঁরা। বিছানায় একে অন্যের বাহুলগ্ন হয়ে কাটান কয়েকটি ঘণ্টা। মাদক ও উত্তেজক নানা ধরনের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে চরম রতিসুখে বিভোর হন তাঁরা।

এভাবে মাসে কয়েকবার করে চলে দু'জনের অভিসার এবং কয়েক মাস তা অজানা

থাকে সকলের। শেষে একদিন প্রবীণ মন্ত্রী দিওয়ান রামজাস জানতে পারেন সকল বৃত্তান্ত।

গোবিন্দ কাউরের দাসী মওলোর সঙ্গে রাজ রন্ধনশালার প্রধান পাচক আমানত খানের ছিল গভীর প্রণয়। সে-ই গোপন কাহিনী জানিয়ে দিয়েছিল আমানত খানকে। আর আমানত খানের কাছ থেকে তা জেনেছিল তার বন্ধু আলি মোহাম্মদ। আর প্রভুভক্ত ভৃত্য হিসেবে সে সবকিছু জানিয়ে দেয় মনিব দিওয়ান রামজাসকে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রশাসনের ওপর জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল—কারণ তাদের অভাব-অভিযোগ শোনার সময়ই পেতেন না তিনি। তার বিরুদ্ধে জনসাধারণ তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল—তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছিল তারা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে পদচ্যুত করার জন্য উপযুক্ত প্রমাণসহ কোনও অভিযোগ যেহেতু দাঁড় করানো যায় নি, তাই রাজ্যের মন্ত্রীগণ তক্কে-তক্কে থাকেন কিভাবে কখন প্রধানমন্ত্রী ও গোবিন্দ কাউরকে হাতেনাতে ধরা যায়। এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁরা ঠিক করেন—দুই প্রণয়ীকে ধরতে হবে জলন্ধরের পথে। রাজ্যের উপকণ্ঠে একদল সৈন্য মোতায়েন করা হয়, আর গুলাম জিলানি ও গোবিন্দ কাউর ধরা পড়েন একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়।

প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়, পরে তাঁকে নির্বাসন দেয়া হয় রাজ্য থেকে। রাজকুমারীকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয় প্রাসাদের একটি কক্ষে, কয়েক মাস পরে মুক্তি পান তিনি ।

প্রধানমন্ত্রী কিংবা নিজের ভাগ্য নিয়ে একটুও চিন্তিত ছিলেন না রাজকুমারী, কারণ গুলাম জিলানির প্রতি তাঁর কোনও আনুগত্যও ছিল না। যৌন-সম্ভোগের ব্যাপারটিই ছিল তাঁর কাছে মুখ্য। এ-ঘটনার কিছুদিন পর যখন তিনি বরিয়াম সিংয়ের প্রেমে পড়েন তখন উদ্‌ঘাটিত হয় তাঁর প্রকৃত স্বরূপ।

রাজকুমারীর প্রেমাভিসার

অনেক পুরুষের সঙ্গেই গোপন সম্পর্ক ছিল রাজকুমারী গোবিন্দ কাউরের, তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, উত্তেজনাপূর্ণ ও স্থায়ী প্রেম ছিল তাঁর কর্নেল বরিয়াম সিংয়ের প্রতি। তিনি ছিলেন রাজ্যের সশস্ত্রবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তাঁর পূর্বপুরুষরা আগের মহারাজাদের সেবায় অনেক শৌর্যবীর্যমণ্ডিত অবদান রেখেছেন। গোবিন্দ কাউরের প্রাসাদের প্রহরায় নিয়োজিত সান্ত্রিদের ব্যাপারে তদন্ত চালাতে গিয়ে রাজকুমারীর আবেদনময়ী সৌন্দর্যের শিকার হন তিনি। তারপর দেখা দেয় সেই পুরনো সমস্যা : কিভাবে মিলিত হওয়া যায় রাজকুমারীর সঙ্গে? প্রধান ফটকে থাকে সশস্ত্র প্রহরী, আর রাজকুমারীর বাইরে যাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় বাসন্তী নামের এক প্রাসাদ-পরিচারিকা কাজ করতো রাজকুমারী ও বরিয়াম সিংয়ের দূতী হিসেবে । তবে সিং মিলনের উপায় খুঁজে পান শিগগিরই।

প্রাসাদের ভেতরে ছিল একটি ইঁদারা, এর পানি রাজপরিবারের কাজে ব্যবহৃত হতো। আর ইঁদারার দেয়াল সংযুক্ত ছিল প্রাসাদের বাইরের প্রাচীরের সঙ্গে। এক ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে সুড়ঙ্গ কেটে ওই ইঁদারার মধ্যে প্রবেশের ব্যবস্থা করেন বরিয়াম সিং। উপর থেকে দড়িসহ বালতি নামিয়ে দিতেন রাজকুমারী, আর ওই দড়ি বেয়ে উপরে উঠে রাজকুমারীর প্রাসাদে ঢুকে পড়তেন বরিয়াম সিং। এ-ব্যাপারে রাজকুমারীকে সহায়তা করতো তাঁর বিশ্বস্ত পরিচারিকা।

জাঁকালো পোশাক পরে বরিয়াম সিংকে অভ্যর্থনা জানাতেন রাজকুমারী। সোনার খাটে পাতা হতো মখমলের চাদর, নকশা-করা বালিশ। জুঁই ও গোলাপ ফুলে সাজানো হতো বিছানা। নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে রাত ভোর করে দিতেন দু'জনে। সূর্য ওঠার আগেই বরিয়াম সিং একই ভাবে ইঁদারার ভেতর দিয়ে প্রাসাদের বাইরে চলে যেতেন। তার আগে সুড়ঙ্গমুখের ইট ঠিকঠাক বসিয়ে আগের মতো করে রাখতেন। এভাবে গোপন মিলন চলে দু'বছর ধরে, কেউ কিচ্ছু টের পায় না।

শেষ পর্যন্ত কপুরথালা রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার দানিশমন্দ জেনে ফেলেন ব্যাপারটা। বরিয়াম সিংয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল না, কাজেই সুযোগটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে উদ্যোগী হন তিনি। এক রাতে টহল-পুলিশরা বরিয়াম সিংকে দেখে প্রাসাদে ঢুকতে। তারা থানায় কর্তব্যরত অফিসারের কাছে খবরটা দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে তা জানানো হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ১২ জন কনস্টেবলকে নিয়ে

দ্রুত ছোটেন প্রাসাদের দিকে। বরিয়াম সিং ও রাজকুমারীকে হাতেনাতে ধরার জন্য তাঁরা প্রাসাদের সব ফটক খোলেন একে-একে। তবে ফটক খোলার ব্যাপারটা টের পেয়ে বরিয়াম সিং ও রাজকুমারী সুড়ঙ্গপথে প্রাসাদ থেকে ১০০ গজ বাইরে এক ইঁদারার কাছে গিয়ে ওঠেন। ওই পথে রাজকুমারী প্রতিদিন স্নান করতে যেতেন। সারা রাত তাঁরা ইঁদারার ঠাণ্ডা পানিতে কাটান, ভোরের দিকে সকলের নজর এড়িয়ে চলে যান প্রাসাদ-এলাকা ছেড়ে। ওদিকে সরদার দানিশমন্দ ও পুলিশবাহিনী প্রাসাদের সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে মরেন বৃথাই।

কপুরথালা থেকে ২০ মাইল দূরে সুলতানপুরের নিকটবর্তী কল্যাণ নামের এক গ্রামে বরিয়াম সিং ও গোবিন্দ কাউর পৌঁছেন পায়ে হেঁটে। গ্রামটি ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন, কাজেই কপুরথালা রাজ্যের পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে না তাঁদের।

বরিয়াম সিং ও গোবিন্দ কাউরের জীবিকার কোনও সংস্থান ছিল না। রাজকুমারী তাঁর ধন-রত্ন ফেলে এসেছিলেন, পরে ভাতা থেকেও বঞ্চিত হন। ওদিকে বরিয়াম সিংও তাঁর পরিবার কর্তৃক অস্বীকৃত ও ত্যাজ্য হন। এক মাটির কুঁড়েঘরে তাঁরা বসবাস করেছেন বাকি জীবন। বরিয়াম সিং ক্ষেতে লাঙল দিতেন, আর রাজকুমারী নিজ হাতে গোবরের ঘুঁটে বানাতেন। এভাবেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেদের প্রেমাপ্লুত হৃদয়ের চাহিদা পূরণ করেছেন তাঁরা।

রত্ন ও রমণী

বরোদার মহারাজা এক অর্থে উপাসনাই করতেন সোনা ও মূল্যবান হীরা-জহরতের। তাঁর দরবারি পোশাক ছিল সোনার সুতায় বোনা। এই সূতা বোনার অধিকার দেয়া হয়েছিল রাজ্যের মাত্র একটি তন্তুবায়-পরিবারকে। ওই পরিবারের সদস্যরা আঙুলের নখ কাটতেন অনেক দীর্ঘ হওয়ার পর। তারপর সেগুলোকে চিরুনির দাঁতের মতো করে বানাতেন। সোনার সুতা বোনার কাজে ব্যবহৃত হতো ওই নখগুলো।

বরোদার মহারাজার সংগ্রহে ছিল অনেক ঐতিহাসিক হীরা। 'স্টার অব দ্য সাউথ' নামের হীরাটি ছিল পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম। ইউজেনি-কে তৃতীয় নেপোলিয়ন যে-হীরাটি দিয়েছিলেন সেটিও ছিল তাঁর সংগ্রহে। তবে তাঁর সবচেয়ে দামি সম্পদ ছিল কয়েকটি ট্যাপেস্ট্রি। রত্ন-জহরতে খচিত সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ মুক্তায় রচিত।

ভরতপুরের মহারাজার সংগ্রহে ছিল আরও চমৎকার সব সামগ্রী। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলো ছিল গজদন্তে নির্মিত। এগুলোর একেকটা তৈরি করতে একটি গোটা পরিবারকে শ্রম দিতে হয়েছে কয়েক বছর ধরে। কপুরথালার শিখ মহারাজার পাগড়িতে ছিল বিশ্বের বৃহত্তম পোখরাজ মণি। সেটার চারদিকে সাজানো ছিল ৩০০০ হীরা ও মুক্তা। জয়পুরের মহারাজার ঐশ্বর্যভাণ্ডার লুকিয়ে রাখা হয়েছিল রাজস্থানের কোনও পাহাড়ের গুহায়। এক দুর্ধর্ষ রাজপুত গোত্র বংশানুক্রমে তা পাহারা দিয়ে এসেছে। প্রত্যেক মহারাজা জীবনে মাত্র একবার সেখানে যাওয়ার সুযোগ পেতেন। গিয়ে তিনি পছন্দমতো মণি-রত্ন নিয়ে আসতেন। সেগুলোই হতো রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রতীক। ওই সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল একটি কণ্ঠহার। তাতে ছিল তিন গাছা চুণি—যার প্রত্যেকটি ছিল পায়রার ডিমের সমান বড়, আর ছিল তিনটি অতিকায় পান্না—এগুলোর মধ্যে বড়টির ওজন ছিল ৯০ ক্যারাট।

পাতিয়ালার শিখ মহারাজার চমকপ্রদ সংগ্রহের মধ্যে ছিল একটি মুক্তার কণ্ঠহার। লন্ডনের লয়েডস কোম্পানি এর বিমা করেছিল ১০ লাখ ডলারে। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল একটি হীরকখচিত বক্ষাবরণ . ১০০১টি নীলাভ-সাদা হীরা দিয়ে শোভিত করা হয়েছিল একে। এ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত পাতিয়ালার মহারাজা বছরে একবার প্রজাসাধারণের সামনে হাজির হতেন শুধুমাত্র ওই বক্ষাবরণ পরে। এ ছাড়া তিনি থাকতেন সম্পূর্ণ নগ্ন, তাঁর গোপনাঙ্গ থাকতো উত্থিত অবস্থায়। এ অনুষ্ঠানটিকে শিবলিঙ্গের প্রতীক-মহিমা দেয়া হতো। মহারাজা ওই অবস্থায় সবার সামনে ঘুরে বেড়াতেন, আর প্রজারা করতালি ও

সোল্লাস-ধ্বনি দিয়ে তাঁর গোপনাঙ্গের বন্দনা করতো। মনে করা হতো, উত্থিত অঙ্গ থেকে রশ্মি বিকীরিত হচ্ছে, আর তাতে রাজ্যের যত অমঙ্গল দূর হয়ে যাচ্ছে।

মহীশূরের মহারাজাকে এক চীনা সন্ন্যাসী বলেছিল, পৃথিবীর সবচেয়ে সার্থক পানীয় তৈরি হয় হীরকচূর্ণ থেকে। ফলে রাজ্যের কোষাগার শিগগিরই হয়ে পড়ে হতশ্রী। প্রাসাদ-কারখানায় শ'-শ' মূল্যবান হীরা পরিণত হয় ধুলায়। বোধোদয় হওয়ার পর অবশ্য কিছু হীরা রক্ষা পায়। সেগুলো দিয়ে বানানো হয় হাতির কর্ণাভরণ। ওইসব হাতির শুঁড় আবার সাজানো থাকতো চুনির অলঙ্কারে। শোভাযাত্রার সময় হাতিগুলোর পিঠে বসতো রঙমহলের বাইজিরা।

বরোদার মহারাজার হাতিকে সাজানো হতো আরও জাঁকালোভাবে। তার বয়স ছিল ১০০ বছর, দাঁত ছিল বিশাল। ওই দাঁত দিয়ে সে ঘায়েল করেছিল ২০টি প্রতিদ্বন্দ্বী হাতিকে । ওই হাতিটির সকল সজ্জা ছিল সোনার—হাওদা থেকে 'শাবরক' পর্যন্ত। হাতিটির দুই কানে ঝুলতো ২০টি সোনার শিকল—২০টি লড়াইয়ে জয়ের পুরস্কার হিসেবে। প্রতিটি শিকলের দাম ছিল ২৫০০০ পাউন্ড।

মহারাজাদের কাছে হাতির মূল্য ছিল অপরিসীম। আসলে একজন মহারাজার মান-মর্যাদা নির্ণীত হতো তাঁর হাতিশালে ক'টি হাতি আছে, সেগুলোর বয়স কত এবং আকৃতি কি তার ওপর। দশহরার দিন মহীশূরে হতো হাতির শোভাযাত্রা। এতে অংশ নিতো এক হাজার হাতি। প্রতিটি হাতির দেহ ঢাকা থাকতো ফুলের মালায় আর কপালে থাকতো রত্নখচিত সোনার অলঙ্কার। সবচেয়ে শক্তিশালী মদ্দা হাতি পেতো মহারাজার সিংহাসন বহনের সম্মান।

বরোদার হাতির লড়াই হতো দেখার মতো এক অনুষ্ঠান। তবে বড় বীভৎস সে দৃশ্য। দু'টি অতিকায় মদ্দা হাতিকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে রোষোন্মত্ত করে লাগিয়ে দেয়া হতো যুদ্ধ। যে পর্যন্ত না কোনও একটি নিহত হতো সে পর্যন্ত চলত ওই যুদ্ধ।

পূর্ব ভারতের ঢেঙ্কানল-এর রাজ্যের মহারাজা প্রতি বছর হাজার-হাজার অতিথিকে দেখার সুযোগ দিতেন হাতিদের অন্য এক খেলা। সে খেলাও জাঁকালোভাবে অনুষ্ঠিত হতো, তবে অত রক্তপাত ঘটতো না। হাতিশালা থেকে বিশেষভাবে বাছাই করা একটি মদ্দা ও একটি মাদি হাতিকে দিয়ে প্রকাশ্যে করানো হতো মৈথুনকর্ম।

মোটরগাড়ির আগমনে রাজকীয় অনুষ্ঠানে হাতির মহিমা হ্রাস পায়। ভারতে প্রথম মোটরগাড়ি আমদানি করা হয় ১৮৯২ সালে। ফ্রান্সের তৈরী একটি 'দে দিয়োন বুতোন' গাড়ি বিশেষ মর্যাদায় স্থান পায় পাতিয়ালার মহারাজার গ্যারেজে। ওই গর্বিত সম্পদের লাইসেন্স প্লেটে নম্বর ছিল '০'। হায়দারাবাদের নিজামের খ্যাতি ছিল কৃপণ হিসেবে, মোটরগাড়ি সংগ্রহের ক্ষেত্রেও সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ রেখেছেন তিনি। রাজধানী এলাকার মধ্যে কোনও চমকপ্রদ গাড়ি তাঁর চোখে পড়লেই তিনি ওই গাড়ির মালিকের কাছে খবর পাঠাতেন—উপহার হিসেবে গাড়িটা পেলে হিজ একজালটেড হাইনেস অত্যন্ত খুশি হবেন। এভাবে ১৯৪৭ সাল নাগাদ শ'-শ' গাড়ি শোভা বর্ধন করে নিজামের গ্যারেজের, কিন্তু এগুলোর একটিতেও কখনও চড়েন নি তিনি।

তবে মহারাজাদের সবচেয়ে প্রিয় গাড়ি ছিল রোলস রয়েস। নানা ধরনের নানা আকারের রোলস রয়েস তাঁরা আমদানি করতেন—লিমুজিন, কুপে, স্টেশন ওয়াগন, এমনকি ট্রাকও। পাতিয়ালার মহারাজার সেই ক্ষুদে দিয়োন মর্যাদা হারিয়েছিল অনেক আগেই, কারণ তাঁর গ্যারেজ ইতিমধ্যে ভরে গিয়েছিল সাতাশটি বৃহদাকার রোলস রয়েসে। সেকালে সবচেয়ে দর্শনীয় রোলস রয়েস ছিল ভরতপুরের মহারাজার—রুপোর পাতে মোড়া একটি কনভার্টিবল। আর সবচেয়ে অদ্ভুত গাড়িটার মালিক ছিলেন আলোয়ার-এর মহারাজা। তাঁর ল্যাংকাস্টার গাড়িটি ছিল বিচিত্র ডিজাইনের—ভেতর-বাহির সোনার পাতে মোড়া। এর স্টিয়ারিং হুইল ছিল গজদন্তখচিত এবং সোনালি জরির একটি কুশনে স্থাপিত। আর পেছনের দিকটি ছিল ইংল্যান্ডের রাজা বা রানীর অভিষেক কোচের হুবহু প্রতিরূপ। তবে এর ইঞ্জিনের নিশ্চয়ই কোনও জাদুকরি ক্ষমতা ছিল। এখনও এই ভারি গাড়িটি তাই অনায়াসে চলতে পারে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে।

মুম্বই-এর উত্তরে অবস্থিত জুনাগড়ের নওয়াবের বিচিত্র প্রীতি ছিল কুকুরের প্রতি। তিনি তাঁর পোষা কুকুরগুলোর জন্য বরাদ্দ করেছিলেন আলাদা-আলাদা ঘর। সে ঘরে টেলিফোন ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল। দেখাশোনার জন্য চাকর-বাকরও ছিল। অমন আরাম আয়েশে জুনাগড়ের কোনও প্রজাও থাকতো না। কুকুরদের জন্য আলাদা গোরস্থান ছিল, কোনও কুকুর মারা গেলে শোকবাদ্য বাজিয়ে শোভাযাত্রাসহকারে নিয়ে যাওয়া হতো সেখানে, তারপর গোর দেয়া হতো নিয়ম মেনে।

নওয়াব তাঁর প্রিয় কুকুরি রোশানা'র বিয়ে দিয়েছিলেন ববি নামের ল্যাব্রাডর কুকুরের সঙ্গে। সে বিয়েতে কল্পনাতীত ধুমধাম হয়েছিল। নওয়াব ভারতের সকল মহারাজা, রাজন্য ও ব্যক্তিত্ব—এমনকি ভাইসরয়কে পর্যন্ত দাওয়াত করেছিলেন। তবে ভাইসরয় যান নি সে বিয়েতে। তা হলেও বরযাত্রায় শরিক হয়েছিলেন দেড় লক্ষ মানুষ। এক বিশাল ভোজসভায় তাঁদের আপ্যায়িত করা হয়েছিল সাড়ম্বরে। ওই বিয়েতে নওয়াবের খরচ হয়েছিল মোট ৬০ হাজার পাউন্ড।

দেশীয় শাসকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন রুস্তমই-দউরান, আরস্তু-এ-যমান, ওয়াল মামালিক, আসিফ জাহ্, নওয়াব মির ওসমান, আলিখান বাহাদুর, মুজাফফর-উল-মুলক নিজাম-উল-মুদ, সিপাহসালার, ফতেহ জঙ্গ, হিজ একজালটেড হাইনেস, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিশ্বস্ত বন্ধু হায়দারাবাদের সপ্তম নিজাম। হালকা পাতলা গড়নের ছোটখাটো মানুষ ছিলেন তিনি। উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, আর ওজন ৯০ পাউন্ডের বেশি নয়। মুখে পান থাকতো সমসময়ই, ফলে দাঁতগুলো গিয়েছিল ক্ষয়ে। সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে বাস করতেন নিজাম। তাঁর আশঙ্কা ছিল, কোনও ঈর্ষান্বিত সভাসদ বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করবে তাঁকে। তাই একজন খাদ্য পরীক্ষাকারী নিয়োগ করা হয়েছিল। দিনের পর দিন ধরে একই খাবার খেতেন নিজাম—পনির, মাখন, মিষ্টান্ন, আর রাতের বেলায় আফিং। দেশীয় শাসকদের মধ্যে একমাত্র নিজামকেই 'একজালটেড হাইনেস' উপাধিতে ভূষিত করেছিল ইংরেজরা, এর কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

সময় ব্রিটেনের যুদ্ধ-তহবিলে তিনি দান করেছিলেন আড়াই কোটি পাউন্ড।

১৯৪৭ সালে নিজাম বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিচিত্র জীবনযাপন নিয়েই আলোচনা হতো বেশি। তালি-দেয়া একটা সুতি পায়জামা এবং টুটাফাটা একটা চটি তিনি পরতেন—স্থানীয় বাজার থেকে এগুলো কেনা হয়েছিল মাত্র কয়েক টাকায়। ৩৫ বছর ধরে একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো ফেজ টুপি শোভা পেতো তাঁর মাথায়। ১০০ সোনার বাসনে আগের নিজামরা খেতেন, কিন্তু এই সপ্তম নিজাম বিছানার ওপর মাদুর বিছিয়ে একটা টিনের বাসনে খেতেন তাঁর খাবার। এত কৃপণ ছিলেন তিনি যে, অতিথিদের ফেলে দেয়া সিগারেটের পোড়া টুকরা আবার আগুন ধরিয়ে টানতেন। সপ্তাহে একদিন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিজামের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। তাঁকে আপ্যায়ন করা হতো এক কাপ চা, একটি বিস্কুট ও একটি সিগারেট দিয়ে।

বেশির ভাগ রাজ্যেই নিয়ম ছিল বছরে এক দিন অমাত্যরা সোনার কোনও কিছু উপহার দেবেন মহারাজাকে, মহারাজা তা স্পর্শ করে আবার ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু হায়দরাবাদে ফিরিয়ে দেয়ার কোনও বালাই ছিল না। প্রতিটি স্বর্ণখণ্ড নিজাম অতি ব্যগ্রতার সঙ্গে মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলতেন, তারপর সিংহাসনের পাশে রাখা একটি কাগজের থলেতে ভরতেন। একবার একটি স্বর্ণখণ্ড তাঁর হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল—তখন তাঁর ছুট দেখে কে? হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে তিনি বের করেছিলেন সেটা।

নিজামের কৃপণতার আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করি এখানে। মুম্বই থেকে একবার এক চিকিৎসক আসেন তাঁকে ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাম দিতে। কিন্তু যন্ত্র আর চালু করতে পারেন না। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিদ্যুৎ-খরচ বাঁচাতে প্রাসাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বন্ধ করে রেখেছেন নিজাম। নিজামের শয়নকক্ষটি ছিল বস্তির কুঁড়েঘরের মতো। ভাঙাচোরা একটি খাট, একটি টেবিল ও তিনটি চেয়ার ছিল ওই কক্ষের আসবাবপত্র। অ্যাশট্রে ও ওয়েস্টপেপার বাস্কেটগুলো বছরে মাত্র একবার, নিজামের জন্মদিনের সময় পরিষ্কার করা হতো। তাঁর অফিসঘরে রাজ্যের বহু মূল্যবান নিদর্শন-সামগ্রী ধূলিমলিন অবস্থায় পড়ে থাকতো। ঘরের সিলিং ছিল মাকড়সা-জালের এক ঘন অরণ্য।

কিন্তু ওই প্রাসাদের এখানে-ওখানেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল অপরিমেয় সম্পদ। নিজামের ডেস্কের এক ড্রয়ারে পুরনো সংবাদপত্রে মোড়ানো অবস্থায় ছিল ২৮০ ক্যারাটের বিশ্ববিখ্যাত জাকব হীরা। নিজাম সেটিকে পেপারওয়েট হিসেবে ব্যবহার করতেন। অযত্নে প্রায় অরণ্যে পরিণত হয়েছিল নিজামের উদ্যান। সেখানে কাদামাটিতে অর্ধেক তলিয়ে যাওয়া কয়েক ডজন ট্রাংকের মধ্যে ছিল তাল-তাল খাঁটি সোনা। নিজামের রত্ন-জহরতের সংগ্রহ ছিল কল্পনাতীত। সেগুলো কয়লার স্তূপের মতো প্রাসাদের এ ঘরে সে ঘরে পড়ে থাকতো গাদাগাদি করে। ২০ লাখ পাউন্ডের বেশি নগদ অর্থ পুরনো সংবাদপত্রে মুড়ে তাকিয়ার নিচে, সিলিঙের উপরে নানা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। প্রত্যেক বছর এর কয়েক হাজার পাউন্ড কেটে কুচিকুচি করতো ইঁদুররা।

[redacted] পেশায় সাংবাদিক। কবিতা ছাড়াও লিখেছেন ছোট গল্প, নাটক। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ গভীর, পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেন ইতিহাস থেকে চলচ্চিত্র, লোকসাহিত্য থেকে কল্পবিজ্ঞান পর্যন্ত অনেক বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ে। বিদেশের জনপ্রিয় উপন্যাস থেকে রসমধুর লোককাহিনী পর্যন্ত অনেক স্মরণীয় সাহিত্যসম্ভার তিনি উপহার দিয়েছেন পাঠক-পাঠিকাদের। ভাব, ভাষা, নির্মাণে মূলের প্রতি পুরোপুরি অনুগত থাকলেও তাঁর অনুবাদে স্বাদ মেলে মৌলিক রচনারই।